মুনতাসীর মামুন

সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বর্তমান সময়

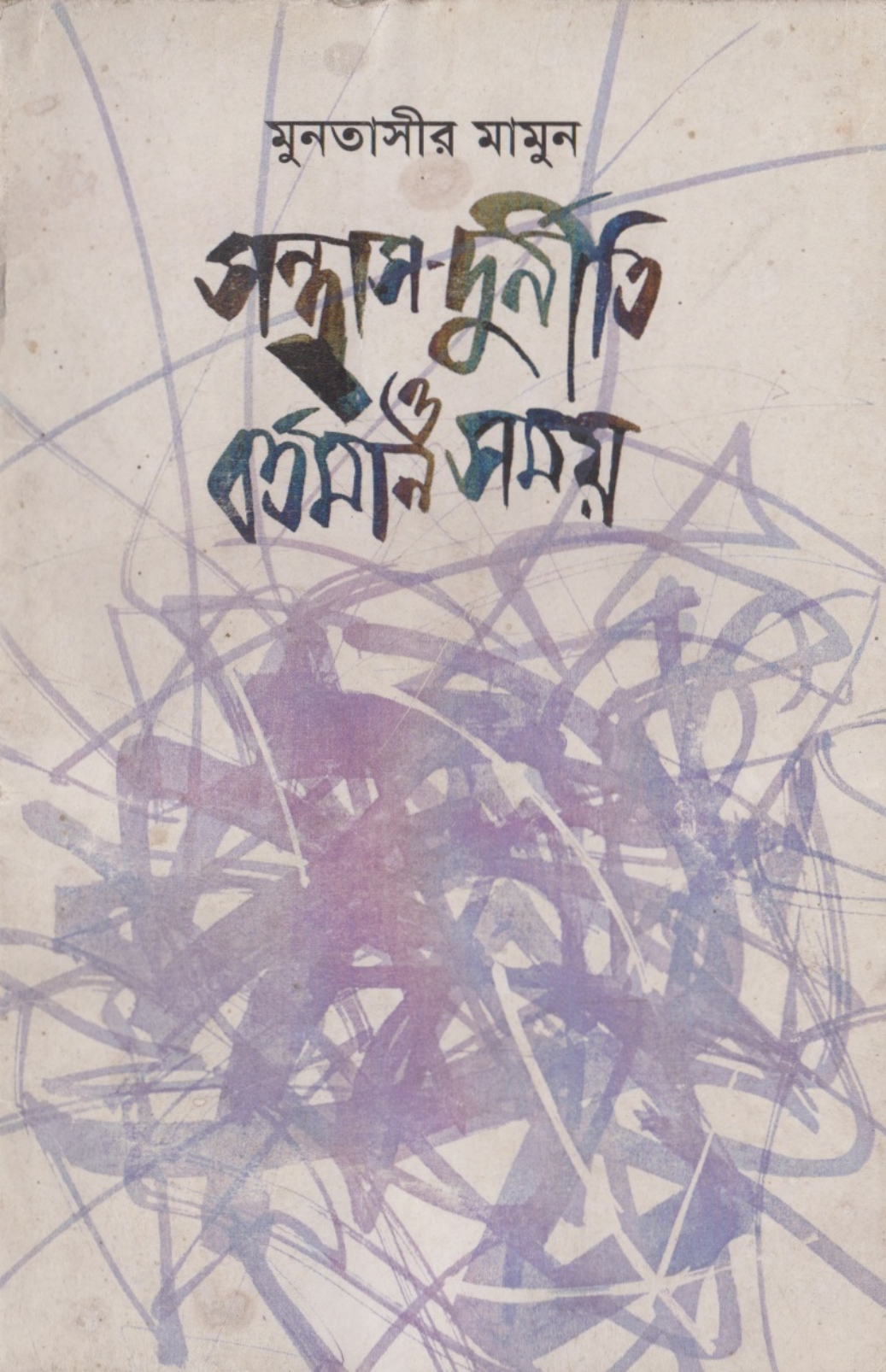

সন্ত্রাস-দুর্নীতি
এবং
বর্তমান সময়

মুনতাসীর মামুন

সিটিজেনস ভয়েস

www.pathagar.com

সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং বর্তমান সময়

মুনতাসীর মামুন

প্রকাশক :
সিটিজেনস ভয়েস
বাড়ি নং ৩/১১, ব্লক-ডি
লালমাটিয়া, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি, ২০০৩
পৌষ, ১৪০৯

প্রচ্ছদ :
হাশেম খান

মূল্য :
৫০ টাকা

পরিবেশক :
সুবর্ণ
১৫০ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
ঢাকা-১০০০

প্যাপিরাস
আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

Santrash-Durniti abong Bartaman Somoy (Terrorism-Corruption and our time) by Muntassir Mamoon. Published by Citizens Voice, Price : 50 Taka only

www.pathagar.com

নিবেদন

গত ৭ অক্টোবরে (২০০২) *সিটিজেনস ভয়েস* ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলো। নতুন এই মানবাধিকার সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার সেই সভায় আমাকে মূল প্রবন্ধটি পড়তে বলেছিলেন। 'সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও নাগরিকের আর্তি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করেছিলাম। আলোচনা শেষে প্রবন্ধটির কপি চেয়েছিলেন অনেকে। তা দেখে বিভুরঞ্জন সরকার অনুরোধ করেন প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে রচনা করার। সে কারণে পুরো প্রবন্ধটি আমি একেবারে নতুন করে লিখেছি 'সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং বর্তমান সময়' নাম দিয়ে।

প্রবন্ধে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তার পরিপূরক হিসেবে ২০০০-২০০২ সালে লেখা আমার নয়টি নিবন্ধ যোগ করি। আমার মনে হয়েছে, এতে প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হবে।

বিভুরঞ্জন সরকারের জন্য এ দুঃসময়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। তাঁকে আবারও ধন্যবাদ জানাই।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি, ২০০৩

www.pathagar.com

মুনতাসীর মামুন রচিত

বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ক কিছু গ্রন্থ :

বাংলাদেশের রাজনীতি : এক দশক (১৯৮৮-১৯৯৮)
বাংলাদেশে ফেরা
মিছিলে কেন ছিলাম
আর কত গুলি খাবে বাংলাদেশ
মেজর জেনারেল ও ফেরি
যে দেশে রাজাকার বড়
ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতায় থাকা
সব সম্ভবের দেশে
হুকুমের দেশ বাংলাদেশ
বড় আলবদরদের কি হবে?
বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রক্রিয়া ও ঐকমত্যের উপাদান
গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে
কারা দেশ চালিয়েছে, দেশ চালাচ্ছে এবং দেশ চালাবে
যেভাবে চলছে এখন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং বর্তমান সময়	৯
কেনো রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করা দুরূহ	৪০
বাংলাদেশে কি তৈরি হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পটভূমি?	৪৩
কাফ্‌ফারা সবাইকে দিতে হবে আগে অথবা পরে	৪৭
মুরগি চুরির ঘটনায় জাতি লজ্জিত হবে কেনো?	৫০
আছেন তো আপনারা সবাই শান্তিতে?	৫৩
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পুলিশ : পরিণতি কী?	৫৫
ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে	৫৯
সাঈদীয় নির্বাচন ও সমাজের সন্ত্রাসীকরণ	৬৩
ওই দেখা যায় চমৎকার	৬৬
পরিশিষ্ট : ১ সরকারি ব্যয় বরাদ্দ : মানব উন্নয়ন লক্ষ্য নয় উপলক্ষ ছিলো মাত্র : অধ্যাপক আবুল বারকাত	৭৪
পরিশিষ্ট : ২ সিটিজেনস ভয়েসের আলোচনা সভার দুটি প্রতিবেদন	৭৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সামছুল আরেফিন

বন্ধুবরেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সন্ত্রাস-দুর্নীতি এবং বর্তমান সময়

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলে এক সময় গর্ববোধ করতাম। ১৯৭১-৭২ সালে, সারা বিশ্ব বাঙালির জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। বর্তমান প্রজন্ম শুনলে অবাক হবে যে, তখন প্রায় কোনো দেশেই বাঙালির ভিসা লাগতো না। এখন ভিসা থাকলেও ঢুকতে দেয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রে। তারপরও দেশের মানুষ, তরুণরা দেশে ছেড়ে যায়নি। আজ, সুদান, ঘানা থেকে শুরু করে ভুটান, নেপালও যদি তাদের দ্বার খুলে দেয় কোনো বাঙালিকে দেশে ধরে রাখা যাবে কি না সন্দেহ। আমার এই উক্তির কারণে, আমার দেশপ্রেম নিয়ে কেউ কটাক্ষ করতে পারেন কিন্তু এটাই বস্তব সত্য। আর যে দেশ সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নীতিহীনতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে সে দেশের জন্য প্রেম কেনো উথলে উঠবে তা বোধগম্য নয়।

এ দেশকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে, এ দেশের বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতিবিদ, সরকারের তিনটি বিভাগ- আইন, নির্বাহী ও বিচার, বিভিন্ন পেশার মানুষজন; সব মিলে একটি চক্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই চক্র নতুন শতকে এসে তাদের নিয়ন্ত্রণ কঠিন এবং জোরালো করেছে। অবস্থার পরিবর্তন যদি না হয়, তাহলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষকে স্রেফ গৃহভৃত্যের জীবনযাপন করতে হবে। বাংলাদেশ পরিণত হবে একটি পূর্ণ রাষ্ট্রের। যে চক্র তাদের চক্রান্তের বলে বর্তমান শাসন জারি করছে তারা দুটি মাধ্যম প্রধানত ব্যবহার করছে- একটি সন্ত্রাস, অন্যটি দুর্নীতি এবং দুটিই আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই চক্রটিকে আমরা এক্স হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি আলোচনার সুবিধার জন্য।

ব্যাপক অর্থে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দক্ষিণপন্থার সমর্থক। এই দক্ষিণপন্থার ভিত্তি অশিক্ষা, অর্ধশিক্ষা, ধর্মীয় অন্ধতা, সংস্কার, দাসসুলভ মনোভাব। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও বাঙালির কোনো প্রশংসা খুঁজে পাইনি। এ কথা বলার পরও বলবো, এর পাশাপাশি মধ্যপন্থী, সংস্কারপন্থী একটি ধারাও সব সময় চলমান ছিলো, (সুফি ইসলাম যার প্রতিনিধিত্ব করেছে) না হলে, জাতি হিসেবে এ জাতির অস্তিত্ব থাকতো না। বৃহৎ এক জনগোষ্ঠী দক্ষিণপন্থার অন্তর্গত— এ বক্তব্য সম্পর্কে অনেকে আপত্তি করবেন এবং আমার মনে হয় তা করবেন আবেগের বশবর্তী হয়ে। অনেকে ১৯৫২, '৫৪, '৬৯-এ গণবিক্ষোভের উদাহরণও দেবেন। এই দক্ষিণপন্থার বীজ নিহিত আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে। গত ১০০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস তা আরো দৃঢ় করেছে। মুসলিম লীগের রাজনীতি সংহত করেছিলো এ অঞ্চলের মানুষের দক্ষিণপন্থাকে। আজ যারা বিএনপি-জামায়াতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের অধিকাংশের পিতা, পিতৃব্য বা দাদা-নানা ছিলেন মুসলিম লীগার। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন একদিকে যেমন দক্ষিণপন্থাকে বিকশিত করেছে; অন্যদিক ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভেরও সৃষ্টি করেছে। এতে ইন্ধন

www.pathagar.com

জুগিয়েছে ধর্মব্যবসায়ীদের ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা এবং ধর্মকে ভিত্তি করে সংস্কার, কুসংস্কার এবং ধর্মীয় অন্ধতা ও অসহিষ্ণুতা প্রচার। একটি উদাহরণ দিই। আমি অনেক ব্যক্তিকে দেখেছি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নিজের পুত্র-কন্যাকেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। অবসর গ্রহণের পর গ্রামে গিয়ে প্রথমেই মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করছেন। প্রাথমিক স্কুল বা গ্রন্থাগার নয়। যে কারণে এ অঞ্চলের মতো মাদ্রাসা/মসজিদ আর কোথাও নেই এবং মাদ্রাসাসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, একথা আবার কেউ বলবে না। দীর্ঘ ২৫ বছরের পাকি প্রচারণাও আমাদের মাগজে গেঁথে আছে যা চরম দক্ষিণপন্থী। অর্ধশিক্ষার উদাহরণও দিতে পারি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও বেশভূষায় সজ্জিত বর্তমান অর্থমন্ত্রী এ কারণেই নির্বিকারভাবে বলতে পারেন, 'কোথাকার কোন্ নজরুল ইসলাম, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার...'। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন নজরুল ইসলাম। সাম্যবাদ তাই এখানে ঠাট্টার বিষয়। উদারনীতিবাদ বিবেচিত হয় 'কুফরি' হিসেবে এবং এর ধারকরা চিহ্নিত হন 'মুরতাদ' বলে। প্রতিটি সরকার নিজ স্বার্থে এবং এই ভয়ে দক্ষিণপন্থাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনকারী দৈনিক *ইনকিলাব* সব আমলে সরকারি প্রশ্রয় পেয়েছে, উদারপন্থী পত্রিকাগুলো পায়নি; বরং নিগৃহীত হয়েছে। এভাবে নিম্নবর্গের ভাবনার জগতে দক্ষিণপন্থা আধিপত্য বিস্তার করেছে। ১৯৪৭ থেকে ২০০১— এই ৫৫ বছরের শাসনামল বিচার করলে দেখবেন, সামরিক বাহিনী, তাদের প্রতিভূ বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি দেশ শাসন করেছে ৪৫ বছরেরও বেশি। মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগ (বা তাদের মিত্র মৃদু বামদের সমর্থনসহ) শাসন করেছে ১০ বছরেরও কম সময়। প্রায় চার দশকের ওপর শাসনের কারণে, দক্ষিণপন্থীরা বিভিন্ন মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। মাঝে মাঝে সংস্কারপন্থী বা মধ্যপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে তখন, যখন ডানপন্থীদের চরম অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এরা ক্ষমতায় এলেই সেই এলিট চক্র (অর্থাৎ সরকারি সামরিক-বেসামরিক আমলা, বিচারক, ধনী ব্যবসায়ী, কাগজ ব্যবসায়ী, শিক্ষক ইত্যাদি) তাদের বিরোধিতা শুরু করে। একটি উদাহরণ দিই, বাংলাদেশে যতো সংবাদপত্র বের হয় তার অধিকাংশ নিরপেক্ষতার ভানে অথবা সরাসরি চার দলীয় জোটের সমর্থক। এবং এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, অধিকাংশ সংবাদপত্রের মালিকরা (অনেকে আবার জাতে ওঠার জন্য নিজেদের সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেছেন) ঋণখেলাপি বা কোনো না কোনো দুর্নীতি বা দু'নম্বরি কাজের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশ তাদের চরিত্র আড়াল করে আরো ক্ষমতাশালী ও সম্পদশালী হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। এদের অনেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এ চক্র একবার ভাঙা গিয়েছিলো সম্পূর্ণভাবে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। সেটি বাঙালির ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাও। বাঙালির ইতিহাসে

www.pathagar.com

স্বাভাবিক জেনারেল জিয়া, এরশাদ বা লায়ার লতিফ প্রমুখ। তবে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থক একটি বড় অংশ শান্তিতে, নিজ নিজ পরিবার, সম্পদ নিয়ে বসবাস করতে চায়। নিপীড়ন-নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে, তাদের পরিবারসমূহ হুমকির সম্মুখীন হলে তখন সাময়িকভাবে বাঁচার জন্য মধ্যপন্থা বা সংস্কারপন্থীদের সমর্থন করে। কিন্তু সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ১৯৫৬, '৬৯ বা ১৯৯০ এর উদাহরণ। এসব জয় ছিলো ক্ষণিকের। কারণ, তারপরই যারা ক্ষমতায় গেছে, তারা উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালিয়েছে মধ্যপন্থী বা বামপন্থীদের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা আবার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে উগ্র বামদের সঙ্গে। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন, দক্ষিণপন্থাকে সবার আগে সমর্থন করেছে উগ্র বামরা। সাধারণ ও মধ্যবিত্তদের একটি অংশ এই ধারার অন্তর্গত। এ দীর্ঘ অবতরণিকা করতে হলো আজকের পরিবেশ বোঝার জন্য। বাংলাদেশে এক নীরব গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৭১ সাল থেকে। সেই গৃহযুদ্ধ কখনো স্থানিক, কখনো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চলছে। এখন সেটি প্রবল আকার ধারণ করতে চাচ্ছে। এই গৃহযুদ্ধ শুরুতে আদর্শিক হলেও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে দুর্নীতির রাজনীতি। ফলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক সন্ত্রাস।

'সন্ত্রাস' এমন একটি শব্দ যে শব্দের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো অর্থ নেই। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় শব্দটি পরিচিত হয়ে উঠেছিলো ব্যাপকভাবে এবং সে থেকে এর সংজ্ঞা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক যার অবসান হয়নি এখনো, বরং সৃষ্টি হয়েছে জটিলতার।

সাধারণভাবে, নিছক সন্ত্রাস বলতে বোঝায় কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর শারীরিক হামলা যা অন্তিমে ঘটায় তার মৃত্যু। আসলে সন্ত্রাস কে, কীভাবে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে সন্ত্রাসের চরিত্র। উইলকিনসন সন্ত্রাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, ক্রিমিনাল টেররিজম, এ সন্ত্রাস ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত স্বার্থে যা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আছে 'রিলিজিও-ম্যাজিকাল' টেররিজম। যার মাধ্যমে ধর্ম ব্যবসায়ীরা মনস্তাত্ত্বিক ভয়ের সৃষ্টি করে। আরো আছে পলিটিকাল টেররিজম বা রাজনৈতিক সন্ত্রাস।

রাজনৈতিকভাবে সন্ত্রাস ব্যবহার নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। যেমন, র‍্যাডিকালরা মনে করেন, এমন কোনো কার্যকলাপ যার সঙ্গে সন্ত্রাসের 'কনভেনশনাল ইমেজ'-এর কোনো মিল নেই, কিন্তু যার কারণে সৃষ্টি হতে পারে যাতনার, হতে পারে মৃত্যু, তাও সন্ত্রাস, যেমন, দারিদ্র্যও সন্ত্রাস। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী সমাজে সন্ত্রাস সম্পর্কে ধারণা খানিকটা রক্ষণশীল যা আবার জনপ্রিয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তারা সন্ত্রাসকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন এভাবে, "So that it both excludes legalized violence yet includes many forms of non-legal or non-authorized action which are quite potently non-violent..."

অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যোগ আছে বিপ্লবের, কারণ, বিপ্লবের কোনো না কোনো পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় সন্ত্রাস। কিন্তু বিপ্লব তখনই সম্পন্ন হয়েছে যখন

www.pathagar.com

সন্ত্রাস সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করতে পারে সরকারের রূপ, সৃষ্টি করতে পারে নতুন 'বডি পলিটিক', পরিবর্তন যেখানে সূচনা করে নতুন যুগ এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্য হয় স্বাধীনতা।

এসব পাশ্চাত্যের প্রত্যয়। আমাদের এখানেও তা কমবেশি প্রযোজ্য। তবে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদের কারণে এর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে নতুন কিছু উপাদান যা বাংলাদেশের সন্ত্রাসকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করবে।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে সন্ত্রাস ছিলো। ফাননের তত্ত্ব ধার করে বলতে হয়, ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি শক্তি ও বিজয়, যার মূল হচ্ছে সন্ত্রাস (প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ত্রিশ দশকের বাংলার বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি মহারাজ নামেও পরিচিত)। ঔপনিবেশিকবাদ হলো সন্ত্রাস- রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। প্রতি-সন্ত্রাসই শুধুমাত্র রোধ করতে পারে ঔপনিবেশিক সন্ত্রাসকে। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যক্তি মাত্রেই হীনমন্য ও অধস্তন করে তোলে। সন্ত্রাসই ব্যক্তিকে শুদ্ধ করে হীনমন্যতা ও অধস্তনতা থেকে। সে জন্য স্বাধীনতার মাধ্যম সন্ত্রাস। ব্যক্তি শুদ্ধ, সমাজ মর্যাদাদীপ্ত হলে স্বাধীনতা যথার্থ হয়।

পাকিস্তানি আমলে উপর্যুক্ত ধরনের সন্ত্রাস ব্যবহৃত হলেও, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিছক সন্ত্রাস, গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিছক সন্ত্রাস, প্রবল দুর্নীতির কারণে সন্ত্রাস হয়নি। তবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাস স্পন্সর শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে এবং রাজাকার-আলবদরদের প্রশ্রয় দেয় বিরুদ্ধ পক্ষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস পরিচালনায়। মুক্তিযোদ্ধারাও অস্ত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাসের জবাব দেয় মতাদর্শের ভিত্তিতে। এই মতাদর্শ ছিলো বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের যুদ্ধ হলো বাংলাদেশের ইতিহাসের হাজার বছরের প্রথম যুদ্ধ যা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত অভিঘাত হেনেছিলো। এই অভিঘাত এতো প্রবল ছিলো যে, পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট সমাজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যা আর জোড়া লাগানো যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের পর অনেকেই ছিলো সশস্ত্র। অস্ত্র অনেকে সমর্পণ করেছিলেন বটে কিন্তু অস্ত্র মজুদও ছিলো অনেক। বাঙালি এই প্রথম অস্ত্রের ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলো। এবং এই শক্তি ব্যবহার করে যে সম্পদ আহরণ করা যায় তাও অনুভব করেছিলো। নতুন সরকার বাঙালির একাংশের এই স্পৃহা দমন করতে পারেনি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের জুন পর্যন্ত এক সরকারি হিসাবে দেখা গেছে, ওই সময়কালে ২০৩৫টি গোপন খুন, ৩৩৭টি অপহরণ, ১৯০টি ধর্ষণ, ৪৯০২ ডাকাতি এবং ৪০২৫ ব্যক্তি ওই সশস্ত্র উগ্রপন্থী দুস্কৃতিকারীদের হাতে খুন হয়েছে। *(আবু সাইয়িদ, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৪৯)।*

ওই সময় মতাদর্শগত লড়াই ছিলো। এক পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা বাংলাদেশ আদর্শে বিশ্বাসী, অন্যপক্ষে মুষ্টিমেয় বাংলাদেশ বিরোধী, উগ্র বামপন্থী (যেমন মতিন, তোয়াহা) যারা বাংলাদেশ স্বীকার করেননি। এ লড়াইয়ে মানুষ মরেছে। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় শোধ-প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। আবার দল ও অস্ত্রের জোরে প্রধানত

www.pathagar.com

অবাঙালিদের সম্পদও লুট হয়েছে। এ কয়েকটি লাইন আরো বিস্তৃত করছি এ কারণে যে, তাহলে আমাদের মনমানসিকতা বোঝা সহজ হবে এবং আগের অনুচ্ছেদে যে মন্তব্য করেছি, তা স্পষ্ট হবে। স্বাধীনতার তিন মাসের মধ্যে (১৯৭২ সালের মার্চে) মওলানা ভাসানী মুজিব শাসনকে মুসলিম লীগ আমলের সঙ্গে তুলনা করে বক্তব্য রাখলেন। যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা দূরের কথা, বাস্তুহারারাও সবাই ফেরত আসেনি। ভাসানীর অভিযোগ মেনে নিয়েও বলা যায় তিনি যে সত্যটি বলেননি তা হলো, তখন প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এবং চরম ডান ও বাম দলগুলো বিনষ্ট করছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। ১৯৭২ সাল থেকেই শুরু হয়েছিলো এ প্রক্রিয়ার। সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি ঘোষণা করলো, বাংলাদেশ ভারতের অধীন এবং স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা কায়েমের জন্য পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। আবদুল হক, আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা, দেবেন শিকদার, অমল সেন প্রমুখের নেতৃত্বে বিভিন্ন চরম বামপন্থী গ্রুপ প্রায় একই ধরনের আহ্বান জানায়। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি গোপনে সমর্থন লাভ করে ভুট্টোর এবং তারা 'মুসলিম বাংলা' স্থাপনের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'মুসলিম বাংলার জন্য যারা কাজ করছে তাদের আমি দোয়া করি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।' এ ধরনের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে ইন্ধন জুগিয়েছে সামরিক ষড়যন্ত্রের এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বিনাশের।

এখানে আরো উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চরিত্র এতোটাই জটিল হয়ে উঠলো যে, খুনি ও রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী শাখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও হয়ে উঠলো কষ্টকর। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি নিয়েও বিবাদ-সংঘর্ষ শুরু হলো। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাদের কর্মকাণ্ড ঢাকার জন্য প্রদান করতো রাজনৈতিক স্লোগান। সব ধরনের লুটের সমন্বয়ে বিকশিত হলো এক ধরনের লুটেরা সংস্কৃতির, যা হীনবল করতে লাগলো সিভিল সমাজকে। এক্সের জন্ম হলো তখন। এর মধ্যে রাজনীতিবিদ, আমলা, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের বিরোধীরা এবং পাকিস্তানি আমলের প্রাক্তন এক্সরাও জড়িত ছিলো। এরাই বঙ্গবন্ধু বিনাশে এগিয়ে এলো। সমাজে স্থায়িত্ব ফিরিয়ে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু বাকশাল ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বিরোধীদের ক্ষমা করেন। এ দুটি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত বাংলাদেশের পরবর্তী ত্রিশ বছরের সন্ত্রাস বিকাশের কাহিনী। ওই চরম ঝঞ্ঝাময় দিনে যখন তিনি সমাজে স্থিরতা ফিরিয়ে আনছেন, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে (এ দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত), তখনই সপরিবারে তাঁকে খুন করা হয়। এর প্রধান কারণ, সমাজে স্থিরতা এলে ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন হলে এবং সম্পদের বণ্টন সুষ্ঠু হলে শেখ মুজিব ও তাঁর মধ্য-মৃদু বাম শাসন হটানো মুশকিল ছিলো। বাকশালের আদর্শ, লক্ষ্য নিয়ে ১৯ জুন ১৯৭৫ সালে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, '... ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই,

www.pathagar.com

আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়তে চাই।' ফলে, আন্তর্জাতিকভাবে যারা এ ধরনের সমাজ-বিরোধী তারাও ইন্ধন যুগিয়েছিলেন তাঁর হত্যায়। কিসিঞ্জার বলেছিলেন, বিশ্বে তিনি যাদের শত্রু মনে করেন তাদের একজন আয়েন্দে আরেকজন শেখ মুজিব। দুজনই মার্কিন লবির সমর্থক সেনাবাহিনী দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

মওদুদ আহমদ লিখেছেন, 'শেখ মুজিবের গৃহীত পরিকল্পনা সাধারণ লোকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতঙ্কিত বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচিতে সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিলো।'

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিলো প্রথম সিভিল সমাজের প্রধান প্রতিনিধিকে হত্যা যা রাষ্ট্র অনুমোদন করেছিলো। এই অনুমোদন নিয়ে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন। তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব বলয় বৃদ্ধির জন্য শেখ মুজিবের হত্যায় খুশি এলিট শ্রেণী ও বাংলাদেশ বিরোধীদের একত্রিত করেন। এক ধরনের মতাদর্শও তৈরি করেন। কেননা বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য মতাদর্শ প্রয়োজন ছিলো। এই সন্ত্রাস অনুমোদনে যুক্ত ছিলো সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচারকদের একাংশ (প্রধান বিচারক সায়েম সিএমএলএ হয়েছিলেন। সাবেক বিচারক সাত্তার যোগ দিয়েছিলেন জিয়ার সঙ্গে। জনাব সাহাবুদ্দীনসহ আরো দুজন বিচারক হাইকোর্টের রায়ে সামরিক শাসন অনুমোদন করেছিলেন, কাজী জাফর ও চরম ডান, ডান, অতি বাম রাজনীতিবিদরা এতে যুক্ত ছিলেন। সমাজে, অন্যান্য পেশা থেকেও মানুষ এসেছিলো। এভাবে পূর্বোল্লিখিত চক্র বেড়ে ওঠে যেটিকে উল্লেখ করেছি এক্স হিসেবে।

জিয়া সন্ত্রাস ব্যবহার করেছিলেন সিলেকটিভভাবে। সশস্ত্র বাহিনী ছিলো তার এই সন্ত্রাসের ভিত্তি। এর জোরে তিনি আবার পাকিস্তানিকরণের দিকে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পাকিস্তানে এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাধ্য হয়েই যুক্ত হয়েছিলেন। এই পাকিস্তানিকরণ ছিলো বাংলাদেশ বা শেখ মুজিবের বিপরীত। জিয়াউর রহমানের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস হলো রাষ্ট্রের মৌল চরিত্রের পরিবর্তন। অস্ত্রের জোরে তিনি সংবিধানের মৌল চরিত্র সংশোধন করেছিলেন, যা বৈধ নয় এবং এখনো নয়। কোনো ব্যক্তি অস্ত্রের জোরে সংবিধান পরিবর্তন করলে তা বৈধ হয় না। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরোধী কাজই শুধু করেননি, তা জোরদার করেছেন এবং এভাবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ, স্বাধীনতা বিরোধীদের শুধু পুনর্বাসন নয়, রাজনীতি করারও সুযোগ দিয়েছিলেন। সিভিল সমাজের একটি বড় অংশ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে বিষণ্ন ও অসংগঠিত হয়ে পড়েছিলো। ফলে সম্ভব হয়েছিলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করা। ক্যান্টনমেন্টে গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে এই দল গঠন করা হয়েছিলো। বলা যেতে পারে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি ছিলো এ দলের ভিত্তি। এক্সরা একে সমর্থন দিয়েছিলো। কারণ, তাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জেনারেল জিয়ার মতো ব্যক্তি ও বিএনপির মতো দল প্রয়োজন ছিলো। এক্স শুধু সমর্থন নয়, অনেক ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে অংশ নিয়ে বিএনপিকে পরিপুষ্ট করেছিলো। মুজিব আমলে যে দুর্নীতির শুরু হয় তার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এ আমলে। নিজ প্রভাব বলয় ভারি করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ও তার খেলাপের সুযোগ দেন জেনারেল জিয়া। বাংলাদেশে ঋণখেলাপি শব্দটি তখনই শুরু। এদের অধিকাংশ পরিণত হয় কোটিপতিতে। ১৯৮১ সালের সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে জমা হয়েছিলো ৫০০ কোটি কালো টাকা। (*হলিডে*, ১৯.৯.১৯৮১)। এমনকি ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমান পর্যন্ত এক বক্তৃতায় বলেন যে, উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত মোট সম্পদের ৪০ ভাগ বিনষ্ট হচ্ছে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য। ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজের পরিচালক আবুল মোমেন লিখেছিলেন : Corruption has been converted from a crime to a habit and the acknowledgement of this fact led to a faster growth of corruption in the country. Follwing it has appeared political corruption which has taken upon itself the protection of their crimes (*BIISS Journal*, 1979).

এভাবে সিভিল সমাজে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে দুর্নীতি যে কারণে, জেনারেল জিয়া দম্ভোক্তি করে বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি কঠিন করে তুলবো।' এবং তিনি যে সফল হয়েছিলেন বর্তমান সময় তার প্রমাণ। এখন সব পর্যায়ের নির্বাচনেই দরকার প্রচুর টাকা ও সন্ত্রাসী ক্যাডার। প্রার্থীদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে দেখা যাবে আছে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মামলা। সৎ রাজনীতিবিদদের এভাবে হটে যেতে হয়েছে রাজনীতি থেকে। এর অর্থ সন্ত্রাসের ভিত্তিতে যে টাকা তা প্রভাবশালীদের মধ্যে ছড়িয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে প্রশাসন সব কিছু দখল করে নেয়া। এটি ছিলো অস্ত্রহীন সন্ত্রাস। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে বিরোধীদের দমনে সেনা হত্যা করেছিলেন ব্যাপকভাবে। তাঁর সতীর্থ লিখেছেন '... ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া। কতজন প্রাণ হারালো, ফাঁসিতে ঝুললো, জেলে গেলো। শ' শ' পরিবারে কান্নার রোল।' (লে. কর্নেল অব. এম. এ. হামিদ, *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, ঢাকা, ১৯৯৩)।

স্বাধীনতা-বিরোধীদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি তথাকথিত ইসলামী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। এদের মাধ্যমে সন্ত্রাসের দ্বিতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। জামায়াত সশস্ত্র হতে থাকে। আইএসআইয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। যে ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে তাহলো আওয়ামী লীগ বিরোধিতা ও ভারতবিরোধিতা এবং পাকিস্তানি ও এক ধরনের 'ইসলামী' মতাদর্শ গ্রহণ। সশস্ত্র বাহিনীর ভয়ে যেমন জিয়ার পক্ষে প্রকাশ্যে একদিকে রাজনীতিক দল গড়ে ওঠে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থা প্রসারের সঙ্গে, জনগোষ্ঠীর একাংশ তাদের মনের গভীরে প্রোথিত দক্ষিণপন্থার পুনরুজ্জীবন ঘটায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজন দিয়ে কীভাবে এ চক্রের বা এক্স-এর সৃষ্টি হয়েছিলো তা বোঝা যাবে একটি হিসাবে। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, '১৯৭৬-৮১ সালের মধ্যে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী হিসেবে যারা কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে ১৩

www.pathagar.com

জন সামরিক কর্মকর্তা, ৮ জন বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ১৮ জন জন শিল্পপতি ও ৩১ জন দলছুট রাজনীতিবিদ। এই ৩১ জনের মধ্যে ১৯ জন ছিলেন নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ বিরোধী।' (এমাজউদ্দিন আহমেদ, 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক: নির্ভর ও দলছুট প্রবণতা, *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ১৯৮৮)।

জিয়াউর রহমান এক্সদের মদদপুষ্ট হয়ে যা করেছিলেন তা হলো :

১. সমাজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা এবং শেষোক্ত পক্ষকে শক্তিশালী করা।
২. জাতীয়তার প্রশ্নে সম্পূর্ণ জাতিকে দু'টি বিবদমান পক্ষে রূপান্তরিত করা।
৩. রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান মেরুকরণ আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধিতা এবং শেষোক্ত রাজনীতির ধারাকে শক্তিশালী করা।
৪. সিভিল সমাজের বিপরীতে সামরিক সমাজকে শক্তিশালী ও আধিপত্যকারী শক্তি হিসেবে বিকশিত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

জিয়ার এক সময়ের সহকর্মী এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ মন্তব্য করেছেন, 'জিয়া সবাইকে ও সবকিছুকে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে দূষিত করেছে। জাতির অবমাননার ক্ষেত্রে শেখ মুজিব থেকে তার অবদান বেশি।' (অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস : এ লিগাসি অফ ব্লাড)

ম্যাসকারেনহাস জিয়ার বিপুলসংখ্যক চেনা-পরিচিত ও অন্যান্যের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে : 'Behind this glitering facade were the more sinister aspect of General Zia's regime. Corruption of a kind hitherto unheard of in Bangladesh ate deeply and irreversibly into the social fabric and everywhere there was a palpable under current of violence.' জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সিভিল সমাজে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিলেন, এখনো তা শুকোয়নি। তিনি শুধু আমাদের নয়, আমাদের দেশের জন্মকেই অপমান করেছিলেন, যা আমরা আবার আজ দেখছি বিএনপি ও জামায়াতের জোট সৃষ্টিতে এবং এ দুটি দলকে এখন আলাদাভাবে বিবেচনা না করলেও চলে। এখানে আরো উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে সেনা কর্মকর্তা ও জিয়াউর রহমান যে আইন ভঙ্গ করেছিলেন, তার বিচার হয়নি। তা হলে এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে? আর আইনের শাসন না থাকলে দুর্নীতি বা সন্ত্রাস বন্ধ হবে কিভাবে? আরো উল্লেখ্য, ১৯৭৫ থেকে রাজনীতিতে বিরোধী exclusion-এর রাজনীতি শুরু হয়েছিলো, যা বর্তমানে আরো জোরদার হয়েছে।

জিয়া শেষ রক্ষা করতে পারেননি এ কারণে যে, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবনতি, সামাজিক অস্থিরতা, সামরিক সন্ত্রাস এবং সাধারণ সন্ত্রাস মধ্যপন্থীদের জন্য যখন পথ সুগম করছে তখন তিনি নিহত হন। কেননা যে চক্র মদদপুষ্ট হয়েছিলো, তাদের তখন জিয়াউর রহমানের দরকার ছিলো না। দরকার ছিলো এরশাদের মতো মানুষের।

জিয়াউর রহমান যা করেছিলেন এরশাদও তা-ই করেছিলেন নির্লজ্জভাবে। বিএনপির

www.pathagar.com

বিচারক আবদুস সাত্তারকে সামনে রেখে তিনি কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি যে জিয়ার ভক্ত, তা প্রমাণের জন্য জিয়ার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করলেন এবং জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দিলেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রীকে বিনে পয়সায় ক্যান্টনমেন্টের দামি জমিতে বাসা, গুলশানে বাসা ও আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলো। সেনাবাহিনীকে এতো সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেয়া হলো যে অচিরেই সিভিল সমাজে সেনাবাহিনী পরিচিত হয়ে উঠলো লিমিটেড কোম্পানি নামে। জিয়ার মতোই সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রের চরিত্র বদল করলেন। একইভাবে গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে জাতীয় পার্টি গঠিত হলো। এতে বিএনপির একটা বড় অংশ এবং এক্সরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিলো। এক্সের পরিধি বৃদ্ধি দুর্নীতির সাহায্যে। এরশাদের দুর্নীতির ফিরিস্তি পাওয়া যাবে দু'খণ্ডে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে। ঋণখেলাপি ও প্রকাশ্য লুটের মাত্রা সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় : '১৯৮৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত শিল্পঋণ সংস্থার মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৭শ' কোটি টাকা। ওই টাকা আটকে ছিলো ৩৮২টি প্রকল্পে। আর সেই ৩৮২টির মধ্যে মাত্র ২২টি প্রকল্পেই ছিলো প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। যার অর্থ হচ্ছে ২২ জন ব্যক্তি বা গ্রুপ শিল্পঋণের প্রায় অর্ধাংশ আত্মসাৎ করে বসে আছে।... অর্থাৎ ওই পাঁচ বছরে (১৯৮৪-৮৯) যেসব ব্যক্তি ঋণের সুযোগ গ্রহণ করেছেন, তাদের বড় অংশই সুস্পষ্টভাবে জনগণের সম্পদকে কুক্ষিগত করেছে।' (আলী রিয়াজ, *গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি : কয়েকটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণ*) ১৯৮৯ সালের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকে জানামতে, কোটি টাকার অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিলো ৮৬৯টি, যাতে জমার পরিমাণ ছিলো ২৩৮৭ কোটি টাকা। (*দৈনিক বাংলা*, ৩১.১২.১৯৯০) এর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী যুক্ত হলো সন্ত্রাস। এরশাদ সিভিল সমাজের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। এতে রাজনীতিবিদদের (সব দল থেকে) একটা বড় অংশ যোগ দিয়েছিলেন অর্থাৎ এক্সের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এভাবেই সন্ত্রাস ও কলুষ সিভিল সমাজের এলিটদের ছাড়িয়ে মধ্যবিত্ততেও ছড়ালো। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা শিশু ছিলো তখন তরুণ হয়ে এ প্রক্রিয়ায় তারাও যুক্ত হয়ে পড়লো। সংসদ যেহেতু বিশ্বে বৈধতার প্রমাণ, সে জন্য সংসদ রাখা হলো কিন্তু নির্বাচনে সন্ত্রাস প্রবলভাবে পৌঁছালো। অস্ত্র ও টাকার সাহায্যে যে ধারা সৃষ্টি হলো তাকে বলা যেতে পারে political exclusion-এর জন্য ভায়োলেন্স।

হোসেন জিল্লুর রহমান এক হিসাবে দেখিয়েছেন, ১৯৮৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ৩ হাজার কেন্দ্রে সংঘর্ষ হয়েছিলো। (*JSS*, 1990)। এ সময় ছাত্ররাজনীতিতে প্রবলভাবে সন্ত্রাস প্রবেশ করে। এরশাদের ছাত্র ফ্রন্ট থেকে রক্ষা পেতে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোও সজ্জিত হয়। এভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাব আগে কখনো হয়নি। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনীতির বিপর্যয়, ধর্মের অপব্যবহার,

www.pathagar.com

তার পারিবারিক জীবন ও প্রকাশ্য লুণ্ঠন পুরো সিভিল সমাজকে বিদ্রোহী করে তুলেছিলো। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, রাজনীতিবিদদের প্রতিও মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠে রাস্তায় নেমে আসে। ফলে পতন ঘটে এরশাদের। কিন্তু এক্সদের? না, সাময়িকভাবে তারা মাথা নিচু করে থাকে সুযোগের প্রতীক্ষায়, যে সুযোগটি পায় তারা ১৯৯০ সালেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জিয়া-এরশাদ একই হলে বিএনপি কেনো থাকলো? এটি ছিলো ক্ষমতা করায়ত্তের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব। সম্পদ বা লুট নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিলো না। থাকলে বেগম জিয়া কি এরশাদের দেয়া (যদিও তখন বিএনপি আমল, কর্তৃত্ব কিন্তু এরশাদের হাতে) কোটি টাকার সম্পত্তি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন? শেখ হাসিনা তা করেননি ১৯৭৫-এর পর। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বেগম জিয়া কখনো স্বামী হত্যার বিচার দাবি করেননি। বিএনপির একজন প্রতিষ্ঠাতা ও বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য কর্নেল অব. অলি আহমদ কয়েকদিন আগে দৈনিক *জনকণ্ঠে* এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জিয়াকে এরশাদই হত্যা করেছিলেন এবং বিনা অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের ফাঁসি দিয়েছিলেন। এখানেও এক্সের লম্বা হাত আমরা লক্ষ করি।

ডান, বাম ও মধ্যপন্থা এরশাদের বিরুদ্ধে দশ বছর সংগ্রাম করেছিলো বটে কিন্তু সফল হয়নি কারণ তিন ধারার একাংশের সঙ্গে সেই চক্রের যোগ ছিলো। এই চক্রের সঙ্গে ক্ষমতাধরদের একাংশের সব সময়ই যোগাযোগ ছিলো। কারণ, তাদের একমাত্র রাজনীতি ছিলো সম্পদ ও তার সাহায্যে ক্ষমতা বৃদ্ধি। এবং আগেই উল্লেখ করেছি, মানুষ একটা পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন করেছিলো। এবং সেই চক্রটিও দেখেছিলো এরশাদ থেকে অন্য কারো আসা দরকার। এরই মধ্যে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলো আন্দোলনের মাধ্যমে। এবং তা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিলো। ১৯৯০ সালে তাই দেখি বিএনপি জয়লাভ করছে রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে। পাকিস্তানের পত্রিকার খবর অনুযায়ী প্রচুর অর্থ নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক প্রধান এসেছিলেন বাংলাদেশে। আওয়ামী লীগ পুরনো আদর্শগত অবস্থায় থাকায় তা পারেনি।

এক্সরা ক্ষমতায় এসেছিলো। বা আনতে সহায় করেছিলো বিএনপিকে। জিয়ার পুরনো মিত্র জামায়াত ও সেই সংলগ্ন দল বা গ্রুপগুলো পুরোমাত্রায় সহায়তা করেছিলো বেগম জিয়াকে। বেগম জিয়ার মন্ত্রিসভা বিশ্লেষণ করলেই তা প্রমাণিত হবে। এ কারণেই এরশাদ আমলের অনেককে দলে ও মন্ত্রিসভায় নিতে হয়েছিলো ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য। কিন্তু, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারে খুব শিগগিরই গণঅসন্তোষে বেগম জিয়াকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়।

১৯৯৬ সালে, আওয়ামী লীগের বিজয় হঠাৎ করে। এ বিজয়কে বিরাট বিজয় বলা যাবে না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর চরম বিরোধিতাকারী আ. স. ম. রব (যিনি বঙ্গবন্ধুর চামড়া দিয়ে জুতো বানাতে চেয়ে 'শু মেকার' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন), যিনি ছিলেন এরশাদের আমলের 'গৃহপালিত বিরোধী নেতা' এবং আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

বিরোধিতাকারী জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে নিতে হয়েছিলো মন্ত্রিসভায়। সহায়তা নিতে হয়েছিলো এরশাদের। এক্সরা এভাবে আওয়ামী লীগ আমলেও ছাড় পেয়ে গেলো এবং অচিরেই তাদের চক্র পুনঃস্থাপনে সচেষ্ট হলো। ভাবা হয়েছিলো, ২১ বছর পর দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে মধ্যপন্থা ও মৃদু বামের আওয়ামী লীগের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে কি-না। কারণ, দু'দশকে এক্সরা বিচারালয় থেকে প্রশাসন, ব্যবসা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবখানে তাদের আসন দৃঢ় করে নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করেছিলো। তবুও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিলো। এবং প্রথম দিন থেকেই এক্সের মুখোমুখি হয়েছিলো। ১৯৭২ থেকে এ ধারা বিকশিত হয়ে পুষ্ট হয়েছিলো। আওয়ামী লীগ যে টিকেছিলো তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

গত ৩০ বছরে এই প্রথম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো। ৩০ বছরে প্রথম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগের সব প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। পাঁচ বছরে জিনিসপত্রের দাম স্থির ছিলো। বন্যা বা দুর্ভিক্ষে কোনো মৃত্যু হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীকগুলো রোপিত হয়েছিলো এবং (বিটিভি ব্যতীত) অবাধ তথ্যপ্রবাহের একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিলো। সামষ্টিক অর্থনীতি দৃঢ় হয়েছিলো এবং সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক পূর্তকাজ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি) হওয়ায় কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছিলো। গঙ্গা পানিচুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অর্থনৈতিক স্থিরতা ও প্রবৃদ্ধি সমাজে স্থিতিশীলতা এনেছিলো, যার উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সেশনজট না হওয়া। সে সময়ও দক্ষিণপন্থার বিপরীতে মধ্যপন্থা ও মৃদু বাম ধারাও জোর পেয়েছিলো।

আওয়ামী লীগ আমলে সন্ত্রাস হয়নি- একথা বলা অর্থহীন। সন্ত্রাস হয়েছে, ধর্ষণও। দীর্ঘদিন পর দল ক্ষমতায় আসায় নেতা-কর্মীদের একাংশ সম্পদ সংগ্রহের আশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। অনেক এমপি, মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্র সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিলো। দুর্নীতিও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এক্সদের একটি অংশের সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও একটি অংশের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিলো। বিরোধী দলকে যথেষ্ট হেনস্তা করা হয়েছে, মামলায় মামলায় অনেককে জেরবার করা হয়েছে, যেমন সাদেক হোসেন খোকা। পুলিশি অত্যাচার কমেনি। তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা দলকে অনেকাংশে অন্তত প্রথম তিন বছর সংযত রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনার শাসনামলে শেষ দুই বছরে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে নেতাদের সৃষ্টি হয়েছিলো দূরত্বের এবং কর্মীরা এসব কর্মকাণ্ড পছন্দ করেনি। এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও আর তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার। দলীয়ভাবে কয়েকটি অঞ্চলে সিলেকটিভ সন্ত্রাস হয়েছে। এবং এর সঙ্গে ভিআইপিরা অথবা তাদের পুত্র বা পরিজনরা জড়িত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে নেয়া হয়েছিলো। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অনেককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। সমাজের সর্বস্তরে এখনকার মতো এভাবে সন্ত্রাস বিস্তৃত হয়নি। তবে, এখানে দু'আমলের সন্ত্রাসের ও দুর্নীতির তুলনামূলক আলোচনা করে কাউকে বেশি বা কম নম্বর দেয়ার ক্ষমতা

www.pathagar.com

আমার নেই। আমি দেখাতে চাচ্ছি, এক্সরা ব্যাকটেরিয়ার মতো কিভাবে প্রতি আমলে নিজেদের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং একেকজনের পতন ঘটায়। এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বও এদের মোহে পড়ে যায়। যন্ত্রণায় ভোগে সাধারণ মানুষ। এর উদাহরণ, আজ পর্যন্ত খুব কম সন্ত্রাসী বা দুর্নীতিবাজের বা জমি দখলকারীর শাস্তি হয়েছে। অথচ সামান্য ঋণের কারণে সামান্য কৃষক গৃহহারা হয়েছে। বলার উদ্দেশ্য একটিই যে, আওয়ামী লীগ এক্সের কবলে না পড়লে সমাজে মধ্যপন্থা ও মৃদু বামধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেতো, যার সুফল ভোগ করতে পারতো পরবর্তী প্রজন্ম। তবে ১৯৭১ সালের পর আওয়ামী লীগই সসম্মানে পুরো মেয়াদ শেষ করে বিদায় নিতে পেরেছিলো। কিন্তু এক্সের কবলে শেষ সময়ে পড়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ সে সুযোগ হারালো। দুর্বলতার পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে এক্স। কারণ, এটি তারা অনুধাবন করেছে পরবর্তী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে তাহলে এক্সদের ক্ষমতায় আসা দুষ্কর হয়ে যাবে। সে কারণে তারা দুবছরের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিকভাবে বিএনপি-জামায়াতকে সামনে রেখে গ্রাম পর্যায় থেকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত পুরো ক্ষেত্রটিকে সংহত করেছে। তাদের ধারণা অমূলক ছিলো না। আওয়ামী লীগের ভোট বৃদ্ধিই তারই প্রমাণ। যতোই আওয়ামী লীগের সময় ফুরিয়েছে এক্সের অধিকাংশ পত্রপত্রিকা বেগম জিয়ার পক্ষে প্রকাশ্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা ও মিথ্যা প্রচারণা করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডানপন্থার উত্থানও এতে সহায়তা করেছে। এর উদাহরণ বুশ, পাকিস্তানে মোশাররফ ও ভারতের বিজেপি। এবং এরা সবাই জোটকে সমর্থন করেছে। এক্সদের কারণেই *সালসা* নির্বাচন হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রবল সন্ত্রাস হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত রাজনৈতিক জোটের আড়ালে এক্সরা এখন ক্ষমতায়।

জর্ডানের রাজা হুসেনের পরামর্শক আদনান আবু ওদেহ বলেছেন, নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাওয়ার পর একটির পর একটি সামরিক ক্যু হয়েছে। মানুষ ভায়োলেন্সকে পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারপর সেটিও বন্ধ হয়ে গেলো। আরব বিশ্বে নিপীড়ন এতো সফলতা পেয়েছে যে, এখন তা জেনেটিক হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতিরা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তৈরি করছেন। জাতীয়তাবাদ, বাথইজম, ইসলামিজম- সব নেপোটিজমের পথ খুলে দিয়েছে। 'যা আছে এখন আমাদের তাহলো আধুনিক রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষ।'

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা কমবেশি প্রযোজ্য। সামরিক ক্যুকে পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে একসময় মনে করা হয়েছে। কিন্তু তাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে শাসক হিসেবে তারা এখন অবাঞ্ছিত। এরপর গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে নিপীড়ন হয়েছে এবং তা যে মাত্রায় পৌঁচেছে তা 'জেনেটিক' হয়ে যাচ্ছে। পরিবার থেকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তৈরি হচ্ছে। *সালসা* নির্বাচনের কারণেই শুধু বিএনপি-জামায়াত জিতেছে একথা আমি বলবো না। বিএনপি স্বতঃস্ফূর্ত ভোটও পেয়েছে এবং দক্ষিণপন্থীদের বিরাট ভোট ভাণ্ডার তাতে যুক্ত হয়েছে। এক ধরনের অদ্ভুত সুবিধাবাদী

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মানুষ। যে কারণে আওয়ামী শাসনের শেষদিকে, সহিংসতার কারণে শায়খুল হাদিস নামে এক নেতাকে গ্রেপ্তার করায় যাবতীয় মোল্লা-মৌলবীরা এটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে নিলো। কিন্তু পুরো কাজটি যে শরিয়ত-বিরোধী তা তারা মনে রাখেনি। কারণ সুবিধাবাদ ও ধর্ম-ব্যবসা। ফলে নির্বাচনে জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলাম- সব মিলিয়ে যুক্তিবিরোধী ও আধুনিকতা এবং প্রগতিবিরোধী এক জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়। এবং এ কারণেই '৭১-এর সন্ত্রাসী শুধু নয়, যুদ্ধাপরাধীরাও ক্ষমতায় আসে। এদেরই সম্মিলিত নাম চারদলীয় ঐক্যজোট বা সংক্ষেপে শুধু 'জোট'।

২

বর্তমান সময়কে এখন সবাই অভিহিত করছেন ভয়ঙ্কর সময় বলে। এবং এ কথাও অনেকে বলছেন, ১৯৭১ সালের পর এমন দুর্যোগপূর্ণ সময় বাংলাদেশে আসেনি। হতে পারে এ মন্তব্য অতিরঞ্জিত কিন্তু অনেকে তা বলছেন। এক্সদের ব্যাপ্তি এখন বাড়ছে এবং তাদের কারণে, প্রভাবে জোট সরকার এতোই বদমত্ত যে, তাদের আন্তর্জাতিক ও দেশি মুরব্বিরা, এমনকি দক্ষিণপন্থা সমর্থনকারী মানুষরাও বিব্রত বোধ করছেন। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে- একথা সত্য। তবে গত ৩০ বছরের বিকাশের ধারা আমাদের দেশকে সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে :

প্রথম ভাগে আছেন সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লাখ; দ্বিতীয় ভাগে আছেন সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ১৩ কোটি ৯০ লাখ।

এই ১০ লাখের সংখ্যাগরিষ্ঠই আমাদের উল্লিখিত এক্সের অন্তর্গত, যাদের মধ্যে রাজনীতিবিদ থেকে বিচারক, ব্যবসায়ী থেকে শিক্ষক- সবাই আছেন। এদের প্রত্যক্ষ সহায়তাকারীর সংখ্যা হবে আরো দ্বিগুণ। প্রায় এই ৩০ লাখ লোকই নানাভাবে দক্ষিণপন্থায় প্রভাবিত করছে নিম্নবর্গকে এবং মানুষজন বর্তমান অবস্থাকে ভয়ানক বলছে প্রধানত একটি কারণে এবং তা হচ্ছে সন্ত্রাস ও এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসছে দুর্নীতির প্রসঙ্গ।

বস্তুত এ সন্ত্রাসের শুরু বিচারক লতিফুরের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই। তিনি রাখঢাক বেশি করেননি। আওয়ামী বিরোধী উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করেছেন এবং প্রথম দিন থেকেই এ বার্তা সবখানে পৌছে দিয়েছেন যে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না। আন্তর্জাতিক সমর্থন তাঁকে আরো শক্তিশালী করেছে। লতিফ, সাহাবুদ্দীন ও সাঈদ মিলে গঠন করা হয়েছে ট্রয়কা। তাদের মদদে ক্যাডারের কাজ করেছে মুয়ীদ, মঈন প্রমুখ 'উপদেষ্টা।' ১ অক্টোবরে *সালসা* নির্বাচন ও ১০ অক্টোবর

www.pathagar.com

জোটের ক্ষমতারোহণ ছিলো ফর্মালিটি মাত্র। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের এমন পরিপূরক অবস্থা আর হয়নি।

স্থানীয় কারণে বাংলাদেশে সন্ত্রাস নতুন রূপ ও মাত্রা পেয়েছে। অর্জন করেছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা অন্য দেশের বা অন্য ধরনের সন্ত্রাস থেকে আলাদা। সন্ত্রাস ব্যাপক অর্থে এখন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক। লক্ষ্য একটাই- এক্সের প্রভাব ও ক্ষমতার ভিত্তি বৃদ্ধি এবং সে কারণে যতো বিরোধিতা আছে তা নিশ্চিহ্নকরণ যাতে ভবিষ্যতে কখনো মধ্য, সংস্কারপন্থী বা মৃদু বাম ক্ষমতায় আসতে না পারে। চিলি ও আর্জেন্টিয়ায় পিনোচেট ও ভিদেলা, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদীরা বর্তমানে পাকিস্তানে মোশাররফ এ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে এর সর্বশেষ উদাহরণ, বিরোধী দলীয় উপনেতাকে বরিশাল ও ভোলায় আটক, গুলিবর্ষণ ও কর্মিসভা করতে না দেয়া।

বাংলাদেশে বর্তমানে এই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য হলো যে রাষ্ট্র তা অনুমোদন করেছে এবং এ অনুমোদনে যোগ দিয়েছেন এক্সের বিভিন্ন জন। তাদের কেউ আছেন বিচারালয়ে, কেউ প্রশাসনে, কেউ এনজিওতে, কেউ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রত্যক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করছে দলের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন স্তরের নেতারা। থ্রিলারে আমরা যেমন দেখি, স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রের অনেক সদস্যকে স্লিপার হিসেবে রাখা হয় নির্দিষ্ট সময়ে জেগে ওঠে প্রভুর কাজ করার জন্য, বর্তমানেও তাই হয়েছে। (যেমন বিভিন্ন দেশে আল কায়েদার সদস্যরা।) গত ১ বছর তিন মাসের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড তা প্রমাণ করে।

সাহাবুদ্দীন-লতিফুর-সাঈদ যে জোটকে ক্ষমতায় নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দিই।

ক্ষমতা নিয়েই লতিফুর এগারোজন সিনিয়র সচিবকে বদলি করে এই সিগন্যাল দিলেন যে এরা আওয়ামী, এদের সরানো হলো। সুতরাং মুয়ীদ চৌ. তারপর ওসি থেকে সচিব বদল শুরু করলেন। এবং ঘোষণা করলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানে কারা ক্ষমতায় আসছে, এখন তারা তাদের কথাই শুনবে, এটা অস্বাভাবিক নয়।' পুলিশ গ্রামকে গ্রাম ঘিরে আওয়ামী সমর্থকদের ধরতে লাগলো বা গ্রাম ছাড়া করতে লাগলো। তালেবান সমর্থক জোটপন্থীরা বোমাবাজি শুরু করলো। বাগেরহাটে বোমা বিস্ফোরণ সে সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লতিফুর তখন বললেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো বোমাবাজি করে বা লাশ ফেলে দেয়, তবে এর দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। পুরো দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।' (*ভোরের কাগজ*, ১৭-৯-০১) লতিফুর ও বেগম জিয়া প্রায় একই সুরে বলেছিলেন, 'যুদ্ধাপরাধী, আলবদর, রাজাকারদের তালিকা নেই, চিনবো কীভাবে?' বেগম জিয়া আরো বলেছিলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে। মিল থাকার কারণ হচ্ছে আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ

www.pathagar.com

নির্বাচন চাই বলে।' (জনকণ্ঠ ১৩.০৯.০০১) অন্যরা নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়নি!
নির্বাচনের ঠিক আগে ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেলরা মাঠে নামেন। তারা যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বলে তা ঢাকা চট্টগ্রাম শহরের কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। আওয়ামী লীগের প্রার্থী থেকে শুরু করে সমর্থকদের পিটিয়েছে, আটকে রেখেছে। এবং ভবিষ্যতেও যদি সাঈদীয় ক্ষমতা নিয়ে সেনাকর্তাদের মাঠে নামানো হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে বর্তমান বিরোধীরা কখনো জয়ের মুখ দেখবে না। কাঠামোগতভাবে এরা উদারনীতি বা মৃদু বামের বিরোধী। কারণ, তারাও বাংলাদেশের সামান্য সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করছে। সাঈদ ইসলামী ব্যাংকের কর্মচারীদের পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন। নির্বাচনকে কলুষিত করার পেছনে এরশাদের সঙ্গে সাঈদ তুলনীয়। প্রতিষ্ঠান নষ্ট করার দায়ে এই লোকটিকে একদিন আদালতে হাজির করানো বাঞ্ছনীয়। একটি উদাহরণ দিই। পত্রপত্রিকায় দেখা গেলো, দোহারের নির্বাচনে ব্যালট পেপার নদীর তীরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সাঈদ তারপর এ নির্বাচনে জোট প্রার্থীকে কিভাবে জয়ী ঘোষণা করেন? উল্লেখ্য, দুর্নীতির দায়ে তার বিরুদ্ধে একটা মামলা স্থগিত রেখেছিলেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন। মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক মহিলা দুদিন থেকে এক জোট প্রার্থীর পক্ষে বিভিন্ন জায়গায় টহল দিয়েছেন, জেনারেল হারুন রাষ্ট্রদূতের চাকরি পেয়েছেন। শোনা যায়, ব্র্যাক বাণিজ্যের কয়েকশ' কোটি টাকার কর মওকুফ করার পেছনে মুয়ীদ ভালো ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মোটা বেতনে ব্র্যাকের নির্বাহী হন। এরপর দুটি ঘটনা ঘটে। তিনি যাকে শিক্ষা সচিব করেছিলেন তার কারণে ব্র্যাক বিনা টেন্ডারে ব্যবসা পায়। অন্যদিকে ব্র্যাকের উদ্যোগে এডাব ভেঙে জামায়াত জোটের সমর্থনে এনজিও সেক্টর বিভক্ত করা হয়। হাফিজুদ্দিন জোট সরকারের একটি কমিশনের প্রধান হয়েছেন। বাকিরা ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ করছেন না। আমি উদাহরণগুলো দিলাম এক্সের নেটওয়ার্ক বোঝার জন্য।
জোটের মন্ত্রিসভার মধ্যে লক্ষ্য করবেন সেই জিয়া আমল ও এরশাদ আমলের মন্ত্রীরা আছেন অর্থাৎ এক্সের ধারাবাহিকতা বজায় আছে। আরো আছেন গত কুড়ি বছরে ধনী হওয়া সহযোগী ব্যবসায়ী, বিভিন্ন দুর্নীতি ও ফৌজদারি মামলার আসামি, যুদ্ধাপরাধী ইত্যাদি। ফলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, অনেকে বিএনপি-জামায়াতকে আলাদাভাবে বিচার করেন, যার তেমন কোনো যৌক্তিতা নেই। বর্তমানে তারা প্রায় একই ধরনের। বিএনপির প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান ওমর (যিনি একজন বীরোত্তমও বটেন) বলেছেন, 'বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, নির্বাচনের সময় বিএনপি নেতাকর্মীরা টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়; কিন্তু জামায়াত নেতাকর্মীরা কখনোই তা হন না। আর বিএনপিতে মোনাফেকের সংখ্যা বেশি, জামায়াতে কোনো

www.pathagar.com

মোনাফেক নেই।' (*ভোরের কাগজ*, ১২.১০.২০০২)
পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সম্পর্কে সে দেশের পদার্থবিদ পারভেজ হুদভয় যা বলেছেন, তা বাংলাদেশ সম্পর্কেও প্রযোজ্য- 'All countries have armies, but in Pakistan things are reversed. Here it is the Army that has a country.'
ক্ষমতায় এসে জোট প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেয় দলীয়করণের। এমন তীব্র দলীয়করণ এর আগে কখনো হয়নি। স্বাধীনতার পর যারা সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের ঢালাওভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। এটি ছিলো এক ধরনের সন্ত্রাস। অর্থাৎ প্রশাসনে কেউ যাতে জোটের কোনো কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা না করে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে সরকারি কর্মচারীদের কাবু করার জন্য এ ধরনের সন্ত্রাস ব্যবহার করে জোট সফল হয়েছে। একই ধারায় বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে, যে ঘটনা গত ৫০ বছরে ঘটেনি। প্রধানত পুলিশ প্রশাসনের মধ্যেই এ সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। সম্প্রতি জানা গেলো, উদয়ন স্কুলে একজন অব. ব্রিগেডিয়ারকে নিযুক্ত করা হয়েছে প্রিন্সিপালরূপে, যিনি এসেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কোনো কানেকশন আবিষ্কার করা যায় কি-না। পূর্ববর্তী আমলের অধিকাংশ প্রবন্ধ, কর্মসূচি তারা বন্ধ করে দেয় এবং এভাবে সরকারের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। এ বিনষ্টকরণ বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। এরপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় দেশ দখলের। অর্থাৎ সম্পদের। এ দখলের মধ্যে ছিলো হিন্দু ও আওয়ামী সমর্থকদের সম্পত্তি দখল। এ প্রক্রিয়া লতিফের সময়ই শুরু হয়। মুয়িদ বাহিনী এতে সম্পূর্ণ সমর্থন যোগায়। মন্ত্রীসভা গঠনের পর এটি চরম আকার ধারণ করে। পাবলিক টয়লেট থেকে সংসদের হোস্টেলের রুম সব দখল হয়ে যায়। অবশ্য, এদের পক্ষে টয়লেট বা সংসদের পার্থক্য বোঝা কঠিন। বাংলাদেশে গত এক বছরে এমন কোনো ব্যবসা নেই যা কোনোরকম চাঁদাবাজি দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। এবং এটা সত্য যে চাঁদাবাজির পেছনে আছে অস্ত্র বা সন্ত্রাস। বুয়েটের সনি হত্যা হয়েছে টেন্ডারবাজির কারণে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী কিছু সন্ত্রাসী জেলে বসে টেন্ডারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এক সংসদ সদস্যকে কয়েকদিনের জন্য জেলের আশ্রয়ে নিতে হয়েছিলো। এই যে চাঁদা ও লুটের কারণ একটি— এর মাধ্যমে নিজেদের অনুগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি। অন্যদিকে, বিরোধীদের নিঃস্বকরণ যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা সম্পদের ক্ষেত্রে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে।
এরপর ছিলো আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক নষ্ট করা। ধরে নেয়া হয় সংখ্যালঘুরা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক; গয়েশ্বর রায়, গৌতম চক্রবর্তীদের মতো অজস্র হিন্দু বিএনপি সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও। এ কারণে, লতিফুরের সময় মুয়িদ বাহিনীর প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর তাণ্ডব শুরু হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে নিরপেক্ষ নামধারী জোট সমর্থক পত্রিকাকে নিজেদের ক্রেডেবিলিটি রক্ষার জন্য এসব অন্যায়ের

www.pathagar.com

খবর ছাপতে হয়েছে। এবং এ খবর সংগ্রহ করার কারণে শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন স্লোগান উঠেছে 'জোট সরকারের দুই গুণ : চাঁদাবাজি আর মানুষ খুন।'

জোটের ক্যাডাররা মানুষ খুন শুরু করেছে লতিফুরের প্রশ্রয়ে। ওই আমলে যখন খুন খারাবি শুরু হয় তখন লতিফ-মুয়ীদ-মঈনুলের নির্দেশে কাউকে ধরা হয়নি। ওই ধারাবাহিকতায় জোট আমলে ব্যাপক খুনের তাণ্ডব বইয়ে দেয়া হয়েছে। থানায় এর কিছু রিপোর্ট করা হয়েছে, কিছু সংবাদপত্রে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা হয়তো আরো বেশি। 'অধিকার'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এবারের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০২ পর্যন্ত সারা দেশে নিহত হয়েছে ৬৮৪ জন। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে খুন হয়েছে সেই সংখ্যা ধরলে তা দ্বিগুণ হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, জ্ঞান জ্যোতি মহাথের, মদন গোপাল গোস্বামী, বগুড়া কৃষক লীগের সহ-সভাপতি এস এম আজম, বরিশাল ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান ফারুক। সিআইডি ইন্সপেক্টর নজরুল ইসলাম, পীরজাদা মোসলেম উদ্দিন আবু বকর মিয়া প্রমুখ, অর্থাৎ শিক্ষক, শ্রমিক, পুরোহিত, পীর, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতাকর্মী কেউ বাদ নেই। বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষের সকাল শুরু হয় দৈনিক পত্রিকায় খুনের খবর পড়ে। যে পড়ে, এবং ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, সে নিজেও জানে না, এরপর সে ফিরবে কি না বাড়িতে। খুন ছাড়া জখমের ঘটনা এতো যে সেটি আর হিসাব রাখা হয় না।

এরপর ধর্ষণ। নারী নির্যাতন, যার অন্তর্গত ধর্ষণ এখন কোনো ব্যক্তিক ঘটনা নয়, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক কৌশল। নারী নির্যাতন (তা শারীরিক মানসিক যাই হোক না কেনো) আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। সব আমলেই ধর্ষণ হয়েছে, তবে, এখন তফাৎটা হচ্ছে এই যে, নারী নির্যাতনের রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। এর দুটি দিক আছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক অধস্তনতা সৃষ্টি করা। প্রতিহিংসার মধ্যে অন্তর্গত ধর্ষণ ও গণধর্ষণ এবং ধর্ষিতার বিবস্ত্র ছবি তোলা, ভিডিও ধারণ করে তা প্রদর্শন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোর সঙ্গে জড়িত বিএনপি ও জামায়াত বা জোট ক্যাডাররা। যে নারীকে ধর্ষণ, গণধর্ষণ বা এসিড মারা হচ্ছে, তিনি বিপক্ষ দলীয় রাজনৈতিক কর্মী হতে পারেন, সমর্থক হতে পারেন। অথবা তার পরিবারের কেউ যুক্ত বিপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে। প্রতিহিংসা চরিতার্থের অর্থ ভীতি সৃষ্টি করা সম্প্রদায়ের মাঝে। অর্থাৎ বিপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে পরিবারের এ অবস্থা হতে পারে। 'অধিকার'-এর হিসাব অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০২ পর্যন্ত সারাদেশে ১০৬৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অক্টোবর ২০০১ থেকে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত ধরলে এ সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হবে। কারণ, বাংলাদেশ হিন্দু-শূন্য করার পোগ্রমে নারী ধর্ষণ ছিলো অন্যতম ঘটনা যার প্রতীক পূর্ণিমা। দৈনিক জনকণ্ঠ অনুসারে জানুয়ারি-জুলাই মাসে (২০০২) নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৬ হাজার ৫৮১টি। এখানে উল্লেখ্য, স্বাভাবিক কারণেই ধর্ষণের সব ঘটনা খবরে বা

www.pathagar.com

থানায় আসে না, অনেক ধর্ষিতা আত্মহত্যা করেছেন। যেসব ঘটনা গত বিএনপি আমলে ইয়াসমীন হত্যার মতো প্রতীক হয়ে মানুষের মনে থাকবে সেগুলো হলো- পুঠিয়ার মহিমা, উল্লাপাড়ার পূর্ণিমা, লালমোহনের ৪০ বছর বয়স্কা প্রতিবন্ধী শেফালী রানী, একই জায়গায় ১০ বছরের গীতা রানী, সর্বশেষ ছবি রানী।

নারী নির্যাতন বিশেষ করে হিন্দু নারীদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে বেশ কটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এখানে বিস্তৃত আলোচনা না করে নারী উন্নয়ন কর্মী রোকেয়া কবিরের একটি রিপোর্টের কিয়দংশ উল্লেখ করছি, 'বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার গ্রামের একটি হিন্দু মেয়েকে কামড় দিয়ে বিএনপি-জামায়াত সন্ত্রাসীরা তার মুখের উপরের অংশের মাংস তুলে নিয়েছে। মংলা থানার চাঁদপাই ইউপির স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারগুলো থেকে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। অন্যথায় যুবতী মেয়েদের তুলে নেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে। আগৈলঝড়ার শেফালী রানীর ওপর অকথ্য নির্যাতন করে বিধবা ভাবীকে ধর্ষণ না করার শর্তে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। পাবনার সুজানগর গ্রামে নৌকায় ভোট দেয়ার অপরাধে নবদ্বীপ কুমার নন্দীর কাছে ৫০ হাজার টাকা ও ৩০ মণ পিঁয়াজ ধার্য করা হয়েছে। পাবনা জেলার সাঁথিয়া থানার খেতুপাড়া ইউপির পাগলা হালদার পাড়ার ২০ ঘর হিন্দুকে মতিউর রহমান নিজামীর বিজয়ের পর গরুর মাংসের খিচুড়ি রান্না করে খেতেও বাধ্য করা হয়েছে।' ধর্ষণের খবর প্রতিদিন খবরের কাগজে পড়লে আমার একটি কথাই বারবার মনে পড়ে। গণধর্ষকরা আক্রমণ করেছে এক হিন্দুবাড়ি। কিশোরীর মা গণধর্ষকদের মিনতি করে বলছেন, 'বাবারা আমার মেয়েটা ছোট, আপনারা একজন একজন করে আসেন।' ভাবছেন ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন, অন্য মা'দের মিনতি করতে হবে, আপনাকে করতে হবে না। মনে করিয়ে দিতে চাই উল্লাপাড়ার পূর্ণিমার মাও ধানের শীষে ভোট দিয়েছিলো।

সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে জুলাই ২০০২ পর্যন্ত নারী নির্যতানের একটি ছক তৈরি করেছে মহিলা পরিষদ। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাত্র ১০টি পত্রিকার ভিত্তিতে করা এই সারণিতে দেখা যায়, নির্যাতিত নারী সংখ্যা ৪ হাজার ২৯৫। বাংলাদেশে প্রকাশিত সব পত্রিকার ওপর ভিত্তি করে সারণি তৈরি করলে এ সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাহলে একবার ভাবুন দেশের অবস্থা কী! পুলিশ প্রায় ক্ষেত্রে শুধু নারী নির্যাতনের নীরব সমর্থকই নয়, তারা নারী নির্যাতনে আইনি একটি আবহ সৃষ্টি করছে। আজকাল দেখা যাচ্ছে, অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে পুলিশ সেই অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন সংশ্লিষ্ট বা সন্দেহভাজনের মা, স্ত্রী বা বোনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসছে। আমি জানি না, কোনো আইনে এটা সম্ভব কিনা। নারীর অবস্থা যেহেতু ভঙ্গুর, সে জন্য এই পন্থা ব্যবহার করা হচ্ছে, যদি আইনি না হয়, তাহলে সরকার এ অবস্থা চলতে দিচ্ছে কেনো? এটিও এক ধরনের নারী নির্যাতন।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতনের উদাহরণ
জুলাই ২০০২

বয়স (বছর)	সংখ্যা	শতকরা হার
১০ বছর পর্যন্ত	৬০	১১
১১-১৫	১২৭	২২
১৬-২০	১০৮	১৯
২১-২৫	১০৩	১৮
২৬-৩০	৬২	১১
৩১-৩৫	৩১	৬
৩৬-৪০	১১	১
৪০+	৩৫	৫
বয়স উল্লেখ নেই	৪৯	৭
মোট	**৫৮৬**	**১০০**

নারী নির্যাতনের আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো শিশু নির্যাতন। মাত্র এক মাসে দেখা যাচ্ছে ১০ বছর পর্যন্ত মেয়ে নির্যাতিত হয়েছে ৬০ জন আর ১০ থেকে ১৫ পর্যন্ত মেয়ে শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ১২৭ জন, যা মোট নির্যাতনের ৩৩ ভাগ। গত জুলাই মাসে নির্যাতনের সংখ্যা ৫৮৬ জন।

যে বিষয়টি আমাদের অনেকের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে তাহলো, নির্যাতনকারীদের একটা বড় অংশের বয়স ১৮-এর নিচে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিশু অপহরণ বা নির্যাতনের বিষয়। অবশ্য এর সব রাজনৈতিক তা নয়। এখানেও উল্লেখ্য, অপহরণকারীদের একটা বড় অংশ খুবই তরুণ। মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ২০ ভাগ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের জন্য যা রাজনৈতিক। কারণ, জোটের একটা উদ্দেশ্যই হচ্ছে হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ। শতকরা ১০ ভাগ জৈবিক নিবৃত্তির জন্য। এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে সীমান্তবর্তী এলাকা, ভোলা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, রাউজান, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নওগাঁ, বরগুনা, নেত্রকোনা, কুমিল্লা, খুলনা, যশোর, সিলেট, চাঁদপুর, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, টাঙ্গাইল এবং চরাঞ্চলে। এসব অঞ্চলের সংসদ সদস্যরা সব জোটের। এখনো সংবাদপত্রের শিরোনাম— 'জেলাজুড়ে চলছে নীরব ধর্ষণ। জড়িতরা সরকারি দলের ক্যাডার।' এবং হিন্দুরা যখনই পারছেন দেশ ত্যাগ করছেন বা করতে চাচ্ছেন। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিজ ভূখণ্ডে ধরে রাখতে পারে না, তাকে কি বলবেন?

এখানে উল্লেখ করতে হয় ৫৪ ধারার কথা। কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলেও কিন্তু সে বিরোধী দলের সমর্থক বা কর্মী বলে তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ৫৪ ধারার এরকম অপব্যবহার আর কখনো হয়নি। আইন কমিশন পর্যন্ত এখন বলছে এ ধারা বদলাতে। গ্রেপ্তারকৃতদের রিমান্ডে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে যা

www.pathagar.com

শুধু আইন বিরোধীই নয়, সংবিধান বিরোধীও। কাপাসিয়ায় জামালের ঘটনা মনে আছে আপনাদের? ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, বাহাউদ্দিন নাছিম, ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত-বাবু ও কোতোয়ালের কথা? যারা নামকরা, তারা একটি ক্ষেত্র থেকে বাঁচছেন তা হলো চাঁদা প্রদান। অন্যদের গ্রেপ্তার করে বা গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে রিমান্ডে নেয়া হয় এবং তারপর মোটা টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশের রমরমা বাণিজ্য এভাবে ভালো চলছে। সর্বশেষ উদাহরণ হলো চট্টগ্রামে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় আক্কাস আলীর মৃত্যু। পুলিশ কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তার আরেকটা উদাহরণ, সংবাদপত্র অনুসারে 'মধ্যরাতে বাসাবাড়িতে পুলিশি তাণ্ডব। নির্যাতন সংস্কৃতিতে নবতর সংযোজন।' মধ্যরাতে পুলিশ সাবেক সচিব মশিউর রহমানের বাসায় শুধু তাণ্ডব চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে কাবার্ডের ড্রয়ারেও খুঁজেছে। পত্রিকার একটি শিরোনাম- 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা দখল করে পুলিশ নিজেরাই ক্লাস করছে'। (*জনকণ্ঠ*, ১৩.৯.২০০২) শামসুন নাহার হলে মধ্যরাতে ঢুকে পুলিশের নির্যাতন তো এখন কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। এখন পুলিশ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সামাজিক কলঙ্কের মতো।

সন্ত্রাসের আরেকটি মাধ্যম হচ্ছে মিথ্যা মামলা দায়ের। পুলিশ বা দলীয় ক্যাডারদের চাঁদা দিলে মামলা থেকে বাদ দেয়া হয়। ক্যাডার সর্দাররা প্রতিটি থানা মনিটর করে। বিষয়টি কী পর্যায়ে গেছে তার একটি উদাহরণ দিই।

কাপাসিয়া থানার মোট মামলার সংখ্যা ৪শ'। একটি মামলাতেই আসামি করা হয়েছে ৪ হাজার জনকে। মোট জড়িত করা হয়েছে ১২ হাজারের বেশি মানুষকে। চট্টগ্রামের চন্দানাইশ থানার মোট মামলার সংখ্যা ৫শ'। একটি মামলায় জামিন নিয়েছে ১১০০ জন। চুয়াডাঙ্গায় ১১টি মামলার জড়িত করা হয়েছে ২৫০০ জনকে। ময়মনসিংহে ৩শ' মামলায় জড়িত করা হয়েছে ৩৭০০ জনকে। (মার্চ ২০০২ পর্যন্ত), নরসিংদীতে ১৬৫টি মামলায় ৬৪৩ জন, রাঙ্গামাটিতে ১০৬টি মামলায় ১২০০ জনকে, খুলনা মহানগরে ২০৩টি মামলায় ২৭০০ জনকে জড়িত করা হয়েছে। (প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া সংগৃহীত পরিসংখ্যান)। এসব মামলায় মানুষজন গৃহহারা। সম্পূর্ণ বাংলাদেশের হিসাব নিলে দেখা যাবে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ এখন গৃহহারা।

অন্যদিকে গত সরকারের দায়ের করা মামলা জোটের মতে, রাজনৈতিক। ফলে তা প্রত্যাহার যোগ্য। এগুলো বিচার করার জন্য বিচারক আবদুল করিমের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন বলছে, দায়েরকৃত মামলায় মাত্র ৩টি খালাস যোগ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে বর্তমান সরকার ১১ মাসে ৩৫০০ মামলা প্রত্যাহার করেছে। খালাস পেয়েছে ৩৮ হাজার ১৯০ জন। প্রত্যাহারের অযোগ্য ৬৪০ মামলা নিয়েও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তদবির চলছে। (*প্রথম আলো*, ২৫.৯.০২) সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর এলাকাধীন ৬২টি ভয়ঙ্কর মামলা প্রত্যাহারের জন্যও চাপ দেয়া হচ্ছে। বলাই বাহুল্য অধিকাংশ নেতা, মন্ত্রীর মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সিলেটে এ কারণেই বোধহয় আজকাল স্লোগান দেয়া হচ্ছে— 'পুলিশ-সন্ত্রাসী ভাই ভাই, ধরা খাওয়ার ভয়

www.pathagar.com

নাই।'... জেলার প্রায় সকল ওসি, এসআই, এএসআই'র মোবাইলে স্টোর করা রয়েছে টপটেররদের মোবাইল নম্বর। (*আজকের কাগজ*, ২০.৯.২০০২) ইউএনডিপির জরগেন লিসনার সম্প্রতি এক সেমিনারে উল্লেখ করেন : 'বাংলাদেশে মানবাধিকার সম্পর্কে পুলিশের ধারণা অত্যন্ত কম।' (*ভোরের কাগজ*, ১৬.৯.২০০২)। এক্সদের নেটওয়ার্কিংটা এতেই বোঝা যায়।

দেশজুড়ে যে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চলছে তার কটি ঘটনা সংবাদপত্রে আসে? খুবই কম। কারণ, অধিকাংশ প্রধান পত্রিকার ঝোঁক জোটের দিকে। তারপরও পত্রিকার ক্রেডিবেলিটির জন্য কিছু সংবাদ ছাপতে হয়। ফলে, সাংবাদিকরা এখন নির্যাতনের সম্মুখীন। ফ্রন্টিয়ার সা রিপোর্টার্স-এর মতে, বাংলাদেশে গত এক বছরে সন্ত্রাসের শিকার ১শ' জনেরও বেশি সাংবাদিক এবং বিশ্বে এ কারণে বাংলাদেশে এখন এক নম্বরে। গত ৫০ বছরে সাংবাদিক নির্যাতনের এমন ঘটনা ঘটেনি। কয়েকদিন আগে জোট নেতা তালেবানপন্থী আমিনী ধর্ম ব্যবসার উদ্দেশে ফরিদপুরে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সেখানে সাংবাদিক ও বিরোধী দলকে তার স্বভাবসুলভ অকথ্য-অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করে। জোট সমর্থক জনৈক মুন সাংবাদিকদের উদ্দেশে ঘোষণা করে, 'এদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। দিগম্বর করে ফাঁসি দেয়া হবে, হত্যা করা হবে।' এবং এরপরই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় এমন দুজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও জামিন দেয়া হয়নি। তালেবান আমিনী ঘোষণা করে, 'ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানসহ বিল আনা হবে' (*প্রথম আলো*, ২৬.৯.২০০২)। আরো উল্লেখ্য, বিএনপির নতুন তরুণ নেতা, যিনি ভাবী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তার সম্পর্কে রিপোর্ট করার ব্যাপারে পত্রিকাগুলো ভয়ে অলিখিত সেন্সরশিপ আরোপ করেছে। খ্যাতিমান প্রবীণ এক সাংবাদিক বোধহয় এই কারণে ইতোমধ্যে ওই তরুণ নেতার প্রশংসা করে একটি প্রশস্তি প্রকাশ করেছেন।

দুর্নীতির কথা আর কী বলবো! ত্রিশ বছরে তা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দুর্নীতিতে এক নম্বর। গত দু'বছর এ স্থান থেকে কেউ বাংলাদেশকে নড়াতে পারছে না। ১৯৭২ সালেও দেশটি গরিব ছিলো কিন্তু ভিসা ছাড়াও মাথা উঁচু করে যে কোনো দেশে প্রবেশ করা যেতো। এখন বাংলাদেশ আগের থেকে সম্পদশালী কিন্তু ভিসা নিয়েও মাথা উঁচু করে কোনো দেশে প্রবেশ করা যায় না। কারণ চোর-জাতি হিসেবে আমরা পরিচিত। কিন্তু এই চুরির সঙ্গে দেশের একভাগ লোকও জড়িত কি-না সন্দেহ।

এই যে দেশজুড়ে সন্ত্রাস তারও ভিত্তি দুর্নীতি, ব্যাপক অর্থে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছে : 'দুর্নীতির সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক গভীর। দুর্নীতির কারণে শারীরিক নির্যাতন, এমনকি হত্যার মতো নারকীয় ঘটনাও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুর্নীতি করার জন্য সাধারণ জনগণের ওপর চাপ প্রয়োগ করে, অর্থ আদায়ের জন্য নির্যাতন করে। সাম্প্রতিককালেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আইনশৃঙ্খলা

www.pathagar.com

রক্ষাকারী বাহিনীর অর্থ আদায় নিয়েও রিপোর্ট প্রায়ই দেখা যায়। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার এক জরিপ থেকে দেখা যায় (সূত্র : দৈনিক *ইনকিলাব*, ১৮.৪.২০০২), সাব-ইন্সপেক্টর থেকে ডিআইজি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের আয় তাদের নিজ নিজ বেতনের এক হাজার গুণ বেশি।' (*রিপোর্ট : করাপশন ডাটাবেজ ২০০১*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারনাশনাল বাংলাদেশ, জুলাই ২০০২)। রিপোর্টে টিআই আরো উল্লেখ করেছে, ২০০১ সালে 'সরকারের ক্ষতির পরিমাণ ১১,২৫৬.২ কোটি টাকা (২.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ১৯৯৯-২০০০ সালের জিডিপির ৪.৭ শতাংশ। গড়ে আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিটি রিপোর্টে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৩.১ কোটি টাকা।' (*ঐ*)

সন্ত্রাস ও দুর্নীতি যে পরস্পর প্রবিষ্ট, তার সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল বারকাত তাঁর একটি প্রবন্ধে। তাই দীর্ঘ সত্ত্বেও তার প্রবন্ধ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

- অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of economy)। আর দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখতে ও অধিকতর দুর্বৃত্তায়িত করার স্বার্থে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (criminalization of politics)। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ফাঁদ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কার্যকর চাহিদা (effective demand) বৃদ্ধি করেছে; আর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করছে
- গত ৩০ বছরে সরকারিভাবে যে ১,৮০,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য এসেছে, তার ৭৫ শতাংশ লুণ্ঠন করেছে অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্বৃত্ত গোষ্ঠী। ফলে ক্ষমতাধররা অধিকতর ক্ষমতাবান হয়েছেন আর ক্ষমতাহীনদের অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ক্ষমতাবানরা এক ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজির (ব্রিফকেস পুঁজি বা কমিশন/দালাল পুঁজি) মালিক হয়েছেন, যে পুঁজি অনুৎপাদনশীল, উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যার কোনোই আগ্রহ নেই।
- ক্ষমতাবানরা এখন কালো অর্থনীতির একটা বলয় সৃষ্টি করেছেন, যে দুষ্টচক্রে বছরে ৬০,০০০ কোটি কালো টাকার সৃষ্টি হয়, যা জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এ বলয়ে যাদের অবস্থান, তারাই আবার ৩০,০০০ কোটি টাকার ঋণখেলাপি (লুণ্ঠন সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে ঋণখেলাপি সংস্কৃতি)। এরাই বছরে ১১,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িত; এরাই বছরে কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ মুদ্রা পাচার (money laundering) করছেন; এরাই অর্থনীতির স্থবিরতার জন্য দায়ী। এরাই আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে এবং/অথবা তাকে ব্যবহার করে সরকারকেও ঋণখেলাপিতে রূপান্তরিত করেছেন।
- দুর্বৃত্তবেষ্টিত সরকার তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে যতো না মানুষকে গুরুত্ব দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় লুণ্ঠনের খাতসমূহকে। যেমন যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগমুক্ত করা সম্ভব

www.pathagar.com

ছিলো, সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে মিগ বিমান কিনতে। বাজেট ঘাটতি হবে অথচ অনুৎপাদনশীল ব্যয় উদ্বৃত্ত হবে। এসব কোন্ ধরনের মানব-হিতৈষী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত?

- ক্ষমতাবান দুর্বৃত্তদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে, যা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী।

তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা কেউ উল্লেখ করেনি। প্রসঙ্গটি জোট সরকার কর্তৃক আদমজী পাটকল বিলুপ্তকরণ, যা পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রশংসিত। ড. বারকাত তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

- রাষ্ট্রায়ত্ত খাত অর্থই লুটপাট, ক্ষমতার অপব্যবহার, ভর্তুকিনির্ভরতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি (অবশ্য এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আমলা-ব্যবস্থাপক উচ্ছিষ্টভোগী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের চিহ্নিত করা ও শাস্তির প্রয়োজনীয়তা কেউই বোধ করেননি)। বেসরকারি খাতের বিকাশ মানেই যতোটা না নতুন বেসরকারি খাতের উদ্ভব, তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বিরাষ্ট্রীয়করণ, যেখানে বেসরকারি মালিকদের (আমলা রাজনীতিবিদদের যোগসাজশে) মূল উদ্দিষ্ট ছিলো হাজার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করা, শিল্পের বিকাশ নয়। বিষয়টির সর্বশেষ সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ- বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করে কমপক্ষে এক কোটি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থহানি ঘটানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, ৩১ বছরে ১২০০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, অথচ কখনো বলা হয়নি যে গত ৩১ বছরে আদমজী ২২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, ব্যাংককে ৩৬৮ কোটি টাকা সুদ দিয়েছে, সরকারকে বিভিন্ন কর বাবদ ৯০০ কোটি টাকা দিয়েছে, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। দাতাগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি ও পাট-প্রতিযোগী দেশের স্বার্থরক্ষা হয়েছে। সরকার বলেছে, পাটশিল্পে আদমজীকেন্দ্রিক বড় মাপের দুর্নীতি হয়েছে। আসলেই সত্য- ওই দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত দুর্বৃত্তরা ১২০০ কোটি টাকা নয় (যে কারণে সরকার বন্ধ ঘোষণা করেছেন), ১২,০০০ কোটি টাকা (৩১ বছরে) লুটপাট করেছে। অর্থাৎ সাধারণ পাটিগাণিতিক হিসেবে আদমজী আসলে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান। কিন্তু শিল্প ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হলে যা ঘটেছে সেটাই স্বাভাবিক।'

অর্থনীতি সমিতির এক সেমিনারে উল্লেখ করা হয়েছে : 'দেশের সামাজিক পুঁজিতে ধস নেমেছে। এখন সর্বস্তরের মানুষ আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। ধর্ষণ, হত্যা, অপরাধসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক হারে। এর বিরূপ প্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক পুঁজিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (*আজকের কাগজ*, ২০.৯.২০০২)

এ কারণেই বোধহয় এমসিসিআই'র সাবেক সভাপতি ও সিঙ্গার কোম্পানির প্রধান নির্বাহী মাহবুব জামিল বলেছেন : 'দুর্নীতি এতোই সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে যে এদেশে ন্যায়পরায়ণ বা সৎ হওয়াটা হচ্ছে ফৌজদারি অপরাধ।' দৈনিক *প্রথম আলো* এ

www.pathagar.com

মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের কাছে জানতে চেয়েছিলো, মন্তব্যটি কি তারা সঠিক মনে করেন? প্রায় ৯০ ভাগ বলেছেন, 'হ্যাঁ'। (*প্রথম আলো*, ১১.১০.২০০২)

এসব বিরোধী দল বা সরকার সমালোচকদের মন্তব্য নয়। যারা বর্তমান দুর্নীতি পরিস্থিতি নিয়ে এসব মন্তব্য করেছেন, তাঁরা সবাই পেশাদার এবং অর্থনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত।

সাধারণ মানুষরা এসব খবর পান খবরের কাগজ পড়ে। কি জানেন তারা? অতি সাম্প্রতিক কয়েকটি উদাহরণ দিই। গম দুর্নীতির কথা ধরুন। গম হিসেবে পোলট্রি ফুড আনা হয়েছে। কয়েকদিন আগে জানা গেলো পচা চাল আমদানি করা হয়েছে। জোট সরকারের দোষ দিই না, তারা জনগণকে হাঁস-মুরগির বেশি মনে করে না। দুর্নীতির কুশীলবদের নাম সরকারি সব তদন্ত কমিশন প্রকাশ করেছে কিন্তু কিছু হয়নি। আওয়ামী আমলে ফ্রিগেট ও মিগ কেনা নিয়ে যথেষ্ট হৈচৈ হয়েছে, যদিও তার দাম নির্ধারণ করেছে সংসদীয় সাব-কমিটি যেখানে সব দলের সদস্যরাই ছিলেন। বিএনপি-জামায়াত কিন্তু আরো বিমান ও যুদ্ধ-জাহাজ কিনছে। দুর্নীতির দায়ে যেসব সংসদ সদস্য, মন্ত্রীর নামে মামলা হয়েছিলো তার সবই প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রথমেই করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের। ক্ষমতায় আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও ভাইয়ের ব্যাংক-ঋণ পুনঃতফসিলকরণ করা হয়েছে। অন্যদের ভাগ্য তেমন নয়। ঘুষের অভিযোগে ডেনমার্ক একজন মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করেছে এবং অনুদানের টাকা প্রত্যাহার করে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। গত সপ্তাহে জানা গেলো ঘুষের কারণে আরো ১৫০ কোটি টাকা ফিরিয়ে নিচ্ছে ডেনমার্ক। সপ্তাহ দুয়েক আগে শিক্ষা সচিব কর্তৃক মুয়ীদ চৌধুরীর ব্র্যাক-কে বিনা টেন্ডারে কাজ দেয়ায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'এটা বড় ধরনের দুর্নীতি। দিনদুপুরে ডাকাতি' (*ভোরের কাগজ*, ২৩.৯.২০০২)। সংসদে ২০০২ সালের জুলাই পর্যন্ত ৩.৮ বিলিয়ন ডলারের অবজেকশন দেয়া হয়েছে, যার নিষ্পত্তি হয়নি। সিএজির দপ্তর এসময় পর্যন্ত ১৬০৮৫টি অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। কিছুই হয়নি (*স্টার*, ২২.৯.২০০২)। প্রতিদিনের দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না।

মানুষ বিপন্ন হলে পুলিশের কাছে যায়, যাবে। কিন্তু পুলিশ আর জোট ক্যাডারের মধ্যে এখন পার্থক্য কম। পুলিশ দেখলেই মানুষ এখন আতঙ্কে ভোগে। তাদের প্রায় সমস্ত কাজ আইন ও সংবিধান-বিরোধী। পুলিশ যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের জোট বাহিনী বলা যেতে পারে, কোহিনূর মিয়া বা আবদুর রহিম এদের প্রতীক। এদের বড় কৃতিত্ব অন্ধকারে মেয়েদের হলে ঢুকে নির্যাতন, নিরীহ অনশনরত ছাত্রদের লাঠিপেটা করা।

পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যায় আদালতে। নিম্ন আদালতের অভিজ্ঞতা আপনাদের আছে কি-না জানি না। গত এক বছর আমি আদালতের সব পর্যায়ে ঘোরাঘুরি করেছি। অন্য মামলার ক্ষেত্রে জানি না কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় যাদের ধরা হচ্ছে তারা কখনো ন্যায় বিচার পাচ্ছে না সেখানে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে নিম্ন আদালত মানুষের ন্যায়-বিচারের পরিপন্থী, এটি না থাকলে মানুষ

www.pathagar.com

খুশি হবে। সেখানে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার কেউ প্রায় ক্ষেত্রে জামিন পাবেন না, পুলিশ চাওয়া মাত্র রিমান্ডে দেয়া হয়। চট্টগ্রামে একজনকে ১১ দিন পর্যন্ত রিমান্ড মঞ্জুর করার নজির আছে। রিমান্ডে নিয়ে অত্যাচার করলে তার ফিরিস্তি দিলে তা আমলে আনা হয় না। অথচ বিএনপি ক্যাডারদের মামলা উঠলে নথি না দেখেই জামিন দেয়া হয়— এরকম রিপোর্টও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সিমির আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়ার জন্য অপরাধীদের মাত্র এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কোথাও না কোথাও কিছু হচ্ছে। ইউএনডিপি'র প্রতিবেদনে জানা যায়, ধনীরা মুচলেকার মাধ্যমে জামিন পেলেও গরিবরা সে সুযোগ পায় না। বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা দৈনিক ১২০ টাকারও কম উপার্জনকারী শতকরা ৭৮ ভাগেরও বেশি দরিদ্র লোকের বিপক্ষে। (*ভোরের কাগজ*, ১৬.৯.২০০২)

এরপর যাওয়া যাক উচ্চ আদালতে। সেখানে এখনো কিছু মানবিক বোধসম্পন্ন বিচারক আছেন দেখে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে। কিন্তু এটি লক্ষণীয়, অনেক ক্ষেত্রে বিচার পাওয়া যায় না। হাইকোর্ট জামিন দিলে শুনেছেন কখনো সুপ্রিম কোর্ট তা স্থগিত করে? কোথাও শুনেছেন, প্রধান বিচারক পুলিশি নির্যাতন বৈধ করেন রায়ের মাধ্যমে? ইটিভির লাইসেন্স যখন বাতিল করা হলো বলা হলো তখন থেকেই তা কার্যকর হবে। ইটিভির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলো। হাইকোর্ট জামিন দিলে তখনই তা কার্যকর হয় না কেনো? কেনো অভিযুক্তকে জামিনের পরও আটকে রাখা হয়? হাইকোর্ট কখনো তা জিজ্ঞেস করে না। অত্যাচারের কথা বললে তা আমলে আনে না। সব বাদ দিন। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কি হলো? সাতজন বিচারক বিব্রতবোধ করছেন। এতো লাজুক বিচারক পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ! এরা বাসা থেকে বের হন কীভাবে? এবং মামলা তাদের সামনে উপস্থাপনের আগেই তারা লজ্জিত, বিচারকের আসনে বসতে নয়। এ হত্যা রাম-শ্যামের হত্যা নয়, যিনি এই দেশ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর হত্যা, ওই নিহত মানুষটির কারণেই তারা গাড়িতে পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এছাড়া ইদানীং বারী সরকার জাতীয় প্রাক্তন বিচারক ও প্রধান বিচারকরা যা বলছেন তাতে বিচার বিভাগের মর্যাদা কমছে। আদালত সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা বদলের সময় এসেছে। আমাদের যদি সব জায়গায় জবাবদিহিতার ব্যাপার থাকে, আদালতের বিচারকদেরও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। কারণ আদালত পাবলিকের টাকায় চলে। পাবলিকের কাছে এর জবাবদিহিতা থাকবে না— তা হতে পারে না।

অর্থাৎ মানুষ আজ নিরাশ্রয়। আমি যে এক্স ফ্যাক্টরটির কথা বলছি তা কি এ কটি উদাহরণে স্পষ্ট হলো? বর্তমান পরিস্থিতিতে চারটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. যা আগেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিপীড়নের ভার তুলে নিয়েছে। দুই. যাই ঘটছে তাকেই ক্ষমতাসীনরা অস্তিত্বহীন বলে ঘোষণা করছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও। তিন. প্রতিহিংসা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় বিস্তৃত করা হয়েছে, যা সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। তারা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিটি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির জন্য

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে। বলছে, আন্তর্জাতিক সহানুভূতি না পাওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রতিদিন হত্যা, চাঁদাবাজির জন্য দায়ী বিরোধীরা যদিও জোট সমর্থক পত্রিকাগুলো লিখছে এসবের জন্য দায়ী বিএনপি-জামায়াত। চার. এসব কারণে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে দায়হীনতা, নীতিহীনতা, আইনহীনতা- যা অন্তিমে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করবে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি এবং যা যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপক্ষে। এ লেখা যখন শেষ করছি তখন পত্রিকায় শিরোনাম 'বরিশালে দিনভর বিএনপি ক্যাডারদের তাণ্ডব।' সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা আব্দুল হামিদ গিয়েছিলেন বরিশাল। তাঁকে সার্কিট হাউসে আটকে রাখে বিএনপি ক্যাডাররা এবং সারা শহর জুড়ে যেখানে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের পায় সেখানেই তাদের প্রতি ভায়োলেন্স প্রকাশ করা হয়। ভোলায়ও গতকাল এর থেকে হিংস্র ঘটনা ঘটেছে। কলারোয়ায় শেখ হাসিনার প্রতি গুলিবর্ষণের কথা আর বিস্তারিত না-ই বা বললাম। সরকারের পোষা বাহিনী অর্থাৎ ওই পুলিশরা নীরব থেকে এ কাজের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করে (*জনকণ্ঠ*, ৫.১০.২০০২) এবং পুলিশ বিরোধীদের কোনো মামলা গ্রহণ করে না (বিশেষ করে রাজনৈতিক)। নারায়ণগঞ্জের সেশন জজও সম্প্রতি প্রহৃত হয়েছেন। পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন চোখে পড়বে 'তেজগাঁওয়ের শিল্পপতিরা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।'

এসব কাজে সাফল্য অর্জনের আনন্দে বিএনপি সংসদ সদস্য ও নেতারা সোনার মুকুট পরছেন। মন্ত্রী এক কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাকুঞ্জে কন্যার বিবাহ দিচ্ছেন। এ ধরনের অভূতপূর্ব ঘটনা আর আগে কখনো ঘটেনি। আর গঠন করা হয়েছে 'গুরুত্বপূর্ণ খাত দ্রুত উন্নয়নসহ নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে ৫ হাজার ১০০টি কমিটি।... একমাত্র ব্যতিক্রম বিদ্যুৎগতিতে ৪২ হাজার আসামির মুক্তি। বাকি সবগুলোর ফলাফল শূন্য।' (*ভোরের কাগজ*, ১০.১০.২০০২)।

আজ জোট সরকারের বর্ষপূর্তিতে, দেশবাসীর তো বটেই জোটের সমর্থকরাও উল্লাস করছে না, যা করছে তা বাধ্য হয়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাংক সাইফুর রহমানকে বলে দিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি না হলে ঋণ হবে না। ওরাল ডায়রিয়ায় আক্রান্ত সাইফুর রহমান আর দম্ভ করে বলছেন না, কোথাকার কোন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, তার আবার ঋণ। বরং নতুন বরের মতো সলজ্জভাবে বলছেন, 'আমরা খুব সহজেই আর ঋণ পাচ্ছি না' (*ইত্তেফাক*, ৩.১০.২০০২)।

১৯৭১-এ ছিলো মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড, বলা হতো তার হাত রক্তে রঞ্জিত। এখন আছেন মেরি এ্যান পিটার্স। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তালেবান সহানুভূতিপূর্ণ সরকার সংস্থাপনে যিনি অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শেই নাকি বাংলাদেশ বদলে দেয়ার ১০০ দিনের কর্মসূচি নেয়া হয়েছিলো। হয়তো সে পরামর্শেই কাজ হয়েছে। সেই মেরি এ্যান পিটার্স আজ বলছেন, 'পার্বত্য অঞ্চলের ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়নের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা অপরিহার্য। আর তা হলেই পার্বত্য এলাকায় বিদেশি বিনিয়োগ আসবে, দাতা সংস্থা উন্নয়ন সহায়তা প্রদানে

www.pathagar.com

আগ্রহী হবে।' (*ইত্তেফাক*, ২০.৯.২০০২) অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কহতব্য নয়। অন্যদিকে আবার তাঁর মুখের ওপর, জোটের মুখপাত্র বলে পরিচিত বায়তুল মোকাররমের খতিব বলেছেন, 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে। এখন বড় পীর (র.) সাহেবের পবিত্র ভূমি বাগদাদ-ইরাক ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।... কোনো অবস্থাতেই সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে মোড়ল বুশদের সমর্থন বা সহযোগিতা করা যাবে না।' জামায়াতের নেতা 'কামরুজ্জামানও বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় কঠোর সমালোচনা করেন' (*জনকণ্ঠ*, ১০.৯.২০০২)। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপ বা তালেবানদের সঙ্গে জড়িত যাদের পুলিশ ধরেছিলো তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তার সর্বশেষ উদাহরণ আল হারমেইনের সাতজন বিদেশিকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদালতে জামিন নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যে ভারতের সহযোগিতার জন্য সাইফুর রহমান ও পরিচিত আমলারা দিল্লিতে ধরনা দিয়ে থেকেছিলেন বা যেই মান্নান ভূঁইয়ারা গত এক বছর ভারতের বিরুদ্ধে একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি আজ তাদের সমর্থক ব্যবসায়ীদের কাছে শুনতে হচ্ছে ভারতীয় পণ্য বয়কট করতে হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যার অর্থ দাঁড়ায় আমেরিকা থেকে চীন বন্ধু হিসেবে উত্তম। ভাগ্যের কি পরিহাস মেরি এ্যান পিটার্স! এক্সরা গত তিন দশক এমনই করেছে।

খুন-খারাবির ঘটনা বাড়ে আর প্রধানমন্ত্রী বিরক্ত হন। যে পুলিশ-বিডিআর তাদের পক্ষে তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিলো আজ তারাই পুলিশকে দুষছেন। কিন্তু মুশকিল হলো তিনি এখন বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না। সবাইকে বিরোধী দমনে যে লাইসেন্স দেয়া হয়েছিলো এখন সে লাইসেন্স আর কেউ ফেরত দেবে না। দ্বিতীয়ত সবাই দেখেছে, এদেশে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি করলে কিছুই হয় না। ১৯৭১-এ হয়নি। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার উচ্চ আদালত করতে অনিচ্ছুক। সুতরাং যেখানে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয় না সেখানে আর অন্য খুন-সন্ত্রাসের কী বিচার হবে! পুরো দেশে এক ধরনের দায়বদ্ধহীনতা দেখা দিচ্ছে, যার মাশুল বিএনপি-জামায়াতকে একদিন এমনভাবে দিতে হবে যে তারা তা ভাবতে পারছে না। আইসিসি'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান এক আলোচনা সভায় বলেছেন : 'ইতিমধ্যে যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে। আর বিলম্ব হলে পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ হবে যে, তা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নাও হতে পারে।' একই সভায় ডেনিশ রাষ্ট্রদূত বলেছেন : 'বাংলাদেশের ইতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে কিছু বলা খুবই কঠিন। উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঠানো প্রতিবেদনে আমাদের বারবার একই কথা লিখতে হয়। আর একই রিপোর্ট পড়তে পড়তে ডেনমার্কের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা তিনটি- সুশাসনের অভাব, সুশাসনের অভাব এবং সুশাসনের অভাব।' (*প্রথম আলো*, ৯.১০.২০০২)

ইতোমধ্যে সে আলামতগুলো দেখা দিচ্ছে। ঢাকা জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রী-এমপিরা বলেন, 'চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নদীর তীরে হাওয়া খায়।

www.pathagar.com

কিন্তু পুলিশ দেখে না। মাদক ব্যবসায়ীর নাম-ঠিকানা দেয়া সত্ত্বেও পুলিশ ধরে না' (*বাংলাবাজার*, ২৯.৯.২০০২)। ইতোমধ্যে চারজন ওয়ার্ড কমিশনার নিহত হয়েছেন। তাদের আতঙ্ক ও আর্তি চোখে পড়ার মতো। গত সপ্তাহে মেয়রকে তারা বলেছেন, 'পুলিশের যোগসাজশে সন্ত্রাসীরা কমিশনারদের খুন করছে।' মেয়র বলছেন, 'ঢাকায় এখন সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম চলছে আর পুলিশ অবিরাম ঘুষ খাচ্ছে' (*জনকণ্ঠ*, ৪.১০.২০০২)। সরকারি নেতা ও মন্ত্রীরা তাদের কর্মচারীদের সম্পর্কে এসব মন্তব্য করছেন। তাহলে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন। মেয়র আরো বলছেন বা হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন, পুলিশের 'দক্ষতা একেবারে নিম্নমানের। ... পুলিশকে ঘুষমুক্ত করতে না পারলে দেশে বিচার পাওয়া যাবে না' (*প্রথম আলো*, ৪.১০.২০০২)। কিন্তু মেয়র খোকা কি জানেন, তাঁর শহরে তাঁর কর্মীরা কি করছে? এই সংবাদটি দেখুন, 'যুবদল নেতা-কর্মীদের চাঁদার দাবির প্রতিবাদে রাজধানীর মিটফোর্ড বালুরঘাটের চারশ' মাঝি বৃহস্পতিবার ধর্মঘট পালন করে' (*জনকণ্ঠ*, ৪.১০.২০০২)। আরেকটি রিপোর্ট দেখুন : 'ভুয়া ডিক্লারেশনে আমদানিকৃত ৫০ মেট্রিক টন ভারতীয় চাল ছিনতাই এবং কাস্টমস কর্মকর্তাদের মারধর ও একজনকে জিম্মি করে নগ্ন ছবিতে পোজ দেয়ানোর বাধ্যকারী বহুল আলোচিত মামলার পলাতক আসামি ক্যাডার হাবিবুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া ভোমরা বন্দরের এক সমাবেশে নৌপরিবহন মন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসী সে যে দলেরই হোক, তাকে রেহাই দেয়া হবে না। এরপর মন্ত্রীকে হরিণের শিঙের লাঠি উপহার দেয়া হয়।' (*ভোরের কাগজ*, ২০.৯.২০০২) হাবিবুরকে নাকি, পত্রিকার খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর এক সভাতেও দেখা গেছে। প্রধানমন্ত্রী তো এসব সন্ত্রাসের কথা কখনোই স্বীকার করেন না; বরং কয়েকদিন আগে বলেছেন, গম কেলেঙ্কারির সঙ্গে কোনো এমপি জড়িত নয়। এ ধরনের প্রকাশ্য প্রশ্রয়ের পর কেনো এক্সের ক্ষমতা বলয় ও সংখ্যার বৃদ্ধি হবে না? কেনো সন্ত্রাসী বা দুর্নীতিবাজরা রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা হবে না? আজ বাধ্য হয়ে খোকারা বিরোধী দলের মতো কথা বলছেন। পুলিশের গণশত্রুর ভূমিকা আমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে না।

ইতোমধ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের চারজন ওয়ার্ড কমিশনার খুন হয়েছেন- একথা আগেই বলেছি। ঢাকা শহরে এখন রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, যারা আধিপত্য বিস্তারকারী সন্ত্রাসীদের হটিয়ে কমিশনার হয়েছিলো, বখরা নিয়ে এখন তাদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধছে। কমিশনারদের অনেকেই সন্ত্রাসী- এটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই নির্বাচন কমিশনার এম. এ. সাঈদ এদের বৈতরণী পারে সাহায্য করেছেন, খোকা তাদের শপথ পড়িয়েছেন। সাঈদ জাতীয় নির্বাচনের সময় মন্তব্য করেছিলেন, দুষ্টুরা পালিয়ে গেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে, আসলে শিষ্টরা পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে থাকছে, নির্যাতনের সময় পালিয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য জায়গায়ও লুটের বখরা নিয়ে হত্যা, পাল্টা হত্যা শুরু হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনার পুলিশ নিরাপত্তা

www.pathagar.com

চেয়েছেন। এ ধরনের নিরাপত্তা শুধু কমিশনার নয়, বিএনপির অজস্র নেতা-কর্মীকেও একসময় নিতে হবে, নিতে হবে বিচারক, সরকারি কর্মচারীদেরও।

জোট যেভাবেই ক্ষমতায় আসুক, যেহেতু একটি ব্যবস্থা মানতে হবে এবং আমরা সংসদীয় ব্যবস্থার পক্ষে, সেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই জোট পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকুক। কিন্তু মনে হচ্ছে জোট যেনো কিছুতেই তাদের মেয়াদ পূর্তি করতে চাচ্ছে না। কিন্তু ইতোমধ্যেই জোট ভালোবেসে মনের মাধুরি মিশিয়ে ভোট দিয়েছিলেন যারা, তারাই বলছেন, ধানের শীষ থেকে বিষ ভালো। আমাদের পরিচিত অনেক জোট সমর্থককে এখন ম্লান মুখে চাঁদা দিতে হচ্ছে। তাদের স্ত্রী-কন্যারা যারা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলো জোট বিজয়ে তারা এখন ঘর থেকেও বের হতে দু'বার ভাবে। কারণ তাদেরও যদি এখন তুলে নেয়া হয়! বিএনপি আগে কখনো টার্ম শেষ করতে পারেনি। আমরা চাইলেও মনে হয় এবারো পারবে না। রাজনৈতিক বিরোধীদের মানুষকে উজ্জীবিত করতে বেশি সময় লাগবে না। বিরোধীদের কথা বাদ দিই। এখন প্রশাসনেও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গত ১২ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন; কর্মকর্তারা বলেন, 'সরকারি দলের লোকদের কারণেই রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আসছে না। থানার ওসিরা পর্যন্ত উপরের কর্তাদের কথায় কান দেন না। তারা মামলা নেন দলীয় লোকের চাপে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সবার আগে সরকারি দলের নেতাকর্মীদের সামলানোর পরামর্শ দেয়া হলে মন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করেন।' (*জনকণ্ঠ*, ১৩.১০.২০০২)

ঔপনিবেশিক শাসনে এ পরিস্থিতি হতে পারে যা শুরুতেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এখন তো উপনিবেশ নেই। সুতরাং এ সন্ত্রাসকে কিভাবে বিবেচনা করবো? কারণ ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে, রাষ্ট্র স্বয়ং নিপীড়নের ভার তুলে নিয়েছে। এবং সরকার সব ধরনের সত্য অস্তিত্বহীন বলে ঘোষণা করছে। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধগুলো হ্রাস পাচ্ছে। এখানেই বাংলাদেশের সন্ত্রাস নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। কিন্তু এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখবে না। বরং একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করবে অথবা এর অস্তিত্বই তখন সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। এর আলামত এখনই দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতি, গণতন্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ৭ আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করেছেন সিপিডি'র ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরার জন্য দীর্ঘ হলেও সেই বিশ্লেষণটি উদ্ধৃত করছি। তার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ২০০২ সালের 'ইকোনমিক ফ্রিডম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' প্রতিবেদনে ১৬১ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ ১৩১তম স্থানে, আর সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন সূচক ২০০২-এ বাংলাদেশ ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম স্থানে রয়েছে। জীবন প্রত্যাশা, শিক্ষা অর্জন এবং আয়ের সমন্বয় বিবেচনায় বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন পর্যায়ভুক্ত দেশ। একটি দেশের টেকসই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নিরিখে তৈরি ২০০২ সালের 'ওয়েলথ অফ নেশনস ট্রায়াঙ্গল' সূচকে ৭০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪তম। দুর্নীতি

www.pathagar.com

সংক্রান্ত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর ২০০২ সালের সূচকে বাংলাদেশ ১০৪টি দেশের মধ্যে ১০৪তম বা সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে, যা এই দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গত বছরও টিআই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো।

জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা আঙ্কটাডের ২০০২ সালের বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও কার্যক্রম সূচকে ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১২৮তম ও ১২২তম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০০১ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতাশীলতা সূচকে ৭৫টি দেশের মধ্যে প্রবৃদ্ধি প্রতিযোগিতাশীলতায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭১তম ও চলতি প্রতিযোগিতায় ৭৩তম অবস্থানে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, গণতান্ত্রিক অবস্থা মূল্যায়নকারী সিডার 'কান্ট্রি ইন্ডিকেটর ফর ফরেন পলিসি' সূচকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান মাঝামাঝি স্থানে। এই সূচকে ১ পয়েন্ট অর্জনকারী দেশ সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ এবং ৯ পয়েন্ট প্রচণ্ড স্বৈরতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

'ওয়েলথ অফ নেশনস ট্রায়াঙ্গল' সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তানের পর বাংলাদেশের অবস্থান। সূচকে এ চারটি দেশের সার্বিক অবস্থান যথাক্রমে ৩৬তম, ৪৮তম, ৬২তম ও ৬৪তম। অর্থনৈতিক পরিবেশে ও সামাজিক পরিবেশে বাংলাদেশের অবস্থান শুধু পাকিস্তানের উপরে। কিন্তু তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অবস্থান চার দেশের মধ্যে সর্বনিম্নে। আবার এই সূচকের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ 'স্কোরকার্ডে' শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ৪২তম, ৪৯তম, ৫২তম ও ৬৪তম। বিনিয়োগ সুযোগ, স্থিতিশীলতা ও ব্যবসার পরিবেশের প্রতিটিতে বাংলাদেশের অবস্থান চার দেশের মধ্যে নিম্নতম।

আবার ২০০২ সালের 'ইনডেক্স অফ ইকোনমিক ফ্রিডমে' শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল ও ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান। সার্বিক অবস্থান মান এই পাঁচ দেশের যথাক্রমে ৫৫তম, ১০১তম, ১০৮তম, ১২১তম ও ১৩১তম। (*প্রথম আলো*, ১৩.১০.২০০২)

কিন্তু তারপর কী হবে ভেবেছেন কি? সামনে রক্তপাত ছাড়া কিছুই দেখছি না। যেসব সরকারি আমলারা জোটের ক্যাডার হিসেবে কাজ করছিলেন তাদের অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, প্রতিহিংসার শিকারও হবেন অনেকে। যতোদিন গত ৩০ বছরের অপরাধীদের বিচার হবে না ততোদিন বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। ইতোমধ্যে জোট, কর্মচারীদের থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখছে। মন্ত্রী আমলাকে বলছেন ডাকাত, গম কেলেঙ্কারিতে তারেকের বন্ধুদের কিছু হয়নি, কিন্তু চাকরি গেছে আমলাদের, পুলিশকে তো সন্ত্রাসীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। প্রতিহিংসা প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে। বিরোধীদলের কর্মীরা, ক্যাডাররা সুযোগ যখন আসবে তখন ভয়াবহ রকমের প্রতিহিংসায় মেতে উঠবে। সে প্রতিহিংসার আগুনে আমরাও হয়তো বাঁচবো না, লাজুক বিচারকদেরও দেখা যাবে ১৯৬৯-এর বিচারক এস. এ. রহমানের মতো

www.pathagar.com

পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে। ব্যাপারটি হয়তো ১৯৭১-এর মতোই হবে এবং হবে আরো ভয়াবহ।

একটি বিষয় আমরা কেউ মনে রাখি না, তাহলো আধুনিক বিশ্বে বর্বর যুগের ধারণা নিয়ে টিকে থাকা যায় না। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রে সবার অর্থনৈতিক সুযোগ গ্রহণের অধিকার থাকবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এবং এ ধরনের দেশে এমন ইসলামিক আদর্শ (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাষ্ট্রে) থাকবে যা আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জামায়াতি, আমিনী, খতিবের ইসলাম ইসলাম নয় ব্যবসা মাত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেনো এদের হঠকারিতায় প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ধ্বংসাবশেষে পরিণত করবে?

জোটের নেতা-কর্মী, সমর্থকরা তা চান কি-না তা ভেবে দেখুন। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। জোটের অধিকাংশই এক্সের সঙ্গে জড়িত নয়, না বুঝে হয়তো সমর্থক। এক্সদের ছাড়া চলা যায় কি-না ভাবুন। কারণ বাংলাদেশে আরেকবার রক্তপাত শুরু হলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে। আমাদের জেনারেশনের অধিকাংশই তা চাই না, যে কারণে এখনো মৃত্যু উপত্যকায় বসবাস করছি।

এককথায় বলা যেতে পারে বাংলাদেশ এখন এক্সদের দখলে। জোট গঠিত এক্সদের দ্বারা, জোট কাজ করে এক্সদের জন্য এবং এক্সরা তাদের কারণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে জোটকে রক্ষা করবে। আইনশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, দুর্নীতির যে চিত্র আপনারা প্রতিদিন দেখছেন পত্রপত্রিকায়, অন্য দেশ হলে বলতো এটি এখন মৃত্যু উপত্যকা। মৃত্যু উপত্যকায় বাস করে দাসরা। প্রাক ১৯৭১ সালে তাই ছিলো। শেখ মুজিব নামে এক স্পার্টাকাসের নেতৃত্বেই গোলামদের জিঞ্জির মুক্ত করা হলো। আজ ত্রিশ বছরে যে এক্সরা লালিত-পালিত হয়েছে বাংলাদেশে, তারা দেশটিকে এখন সেই জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছে। মানুষ একরকম দাসে পরিণত হয়েছে এবং জোট তাই চায়। কারণ দাসদের আত্মসম্মান থাকে না। তখন তাদের শাসন করতে সুবিধা। সেই সাহস থেকেই সর্বশেষ তারা শহীদ মিনারকে, শামসুর রাহমানের ভাষায় গ্রেপ্তার করেছিলো, যা করেছিলো পাকিরা ১৯৭১ সালে। এখানে আপনারা মিল খুঁজে পাবেন বর্তমান শাসকদের পাকি শাসকদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য বোধের। মানুষের প্রতিরোধে শহীদ মিনার মুক্ত হয়েছে। দেশকে মৃত্যু উপত্যকা থেকে বাঁচাতে হলে সেভাবে এগুতে হবে। আমরা যদি আমাদের উত্তরাধিকারদের গোলামের বাচ্চা হিসেবে না দেখতে চাই তাহলে প্রতিরোধ গড়তে হবে। কবে আওয়ামী লীগ বা ১১ দল নেতৃত্ব দেবে, ঐক্যবদ্ধ হবে সেটি ভাবলে দাস-ই থাকতে হবে। আগেও মানুষ, সমাজের গণতন্ত্রীমনা, মধ্যপন্থা, মৃদু বামের সমর্থকরা আগে রাস্তায় নেমেছেন, তারপর রাজনীতিবিদরা এসেছেন। রাজনৈতিক দল নিজস্ব অংক ছাড়া এগুবে না। আমরা এগুলে আমাদের মধ্য থেকেই স্পার্টাকাস জন্ম নেবে। আর যদি ভাবেন, এটিই ভালো, গোলামির জীবনে এক ধরনের স্বস্তি আছে। তাহলে বলার কিছু নেই। শুধু বলতে পারি, সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

০৪.১০.২০০২

www.pathagar.com

কেনো রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করা দুরূহ?

ঘুম থেকে সকালে উঠে যে সংবাদ পড়তে চাই না, প্রতিদিন সকালে উঠে তা-ই দেখতে হয়। এ অভিযোগ আমার নয়, বাংলাদেশের শহরবাসীর সবারই। খবরের কাগজ খুললেই সন্ত্রাস বা খুন বা দখল সম্পর্কিত একটি সংবাদ থাকবেই। অথবা দুর্নীতির। সন্ত্রাস বা দুর্নীতির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আবার গাঢ়। এক অর্থে ফাইল আটকে ঘুষ নেয়াও সন্ত্রাস।

একটি উদাহরণ দিই। ৯ জুলাইয়ের *জনকণ্ঠ* দেখুন। শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় আছে : '১. কক্সবাজারে চারদল ছাত্রলীগ ও পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষ। গুলিতে মহিলার মৃত্যু; ২. খুলনায় এক সন্ত্রাসী হিরকের অবৈধ অস্ত্র আর অর্থ নিয়ে ঢাকা অভিযান; ৩. সহস্রাধিক খুনি অবাধে বিচরণ করছে রাজধানীতে, খুন হচ্ছে প্রতিদিন; ৪. বুশরা হত্যার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা কাদের গ্রেপ্তার; ৫. পলাতক দুই শতাধিক সন্ত্রাসী... ।' একই দিনের *প্রথম আলোয়* আছে এ বিষয়ক ৪টি সংবাদ। ধরে নিতে পারি পত্রিকার রিপোর্টে কিছুটা মনের মাধুরী মেশানো থাকে। তারপরও কি অবস্থাটা খুব সহনীয়?

এসব সংবাদপত্র যখন মফস্বল বা গ্রামে যায়, তখন খবরগুলো আরো ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। কারণ, শহরে এসব কাণ্ড আমাদের গা সয়ে গেছে। আর শহর কারো জন্য থেমে থাকে না। যারা বিদেশে থাকে তাদের মনে হয়, শহরজুড়ে তাণ্ডব চলছে। ফোনে বা ই-মেইলে তারা জিজ্ঞাস করে প্রতিনিয়ত- সব ঠিক আছে তো? আত্মীয়স্বজন কেউ মারা যায়নি তো?

এর বিপরীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিদিন হুঁশিয়ারি প্রদান করছেন এবং বলছেন সরকার সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করেনি, করবে না। কিন্তু বাস্তব কি তা-ই? হুঁশিয়ারির বিপরীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যদি হ্রাস না পায়, তাহলে সেই হুঁশিয়ারি খেলো হয়ে যায়। যখন তিনি দক্ষিণাঞ্চলের সন্ত্রাসীদের দমন করলেন তখন তিনি নন্দিত হয়েছেন। এখনো যে নিন্দিত তা নয়। কিন্তু এখন হুঁশিয়ারি প্রদান হয়ে যাচ্ছে বেশি। এদিক থেকে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, তার সরকারের দুর্বলতা সন্ত্রাস পুরোপুরি দমন করতে না পারা। আওয়ামী লীগ আমলেই যে সন্ত্রাস হচ্ছে তা নয়, এরশাদ বা বেগম জিয়ার আমলে কম সন্ত্রাস হয়নি। আমরা আসলে সব সময় বর্তমান দেখি, অতীতেরটা ভুলে যাই। অবশ্য ভোটারদের কাছে বর্তমানই প্রধান, অতীত নয়। যে কারণে অতীত চর্চা করে দুই দল বেশি এগোতে পারেনি বা নিজেদের ভোট বৃদ্ধিও করতে পারেনি। তবে লোকের আশা ছিলো আওয়ামী লীগ হয়তো সন্ত্রাস দমনে সমর্থ হবে। কিন্তু হয়নি পুরোপুরি। পুরোপুরি সন্ত্রাস দমন কখনো সম্ভব নয়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেনো সরকার উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলে সফল হলো, ঢাকা বা চট্টগ্রামে নয়? উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলে যারা সন্ত্রাস করেছে তারা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ। আওয়ামী লীগ বা বিএনপির সঙ্গে জড়িত নয়। ফলে সরকার বা কেন্দ্রে তাদের স্বার্থরক্ষা করার কেউ ছিলো না। ঢাকা বা চট্টগ্রামে ব্যাপারটি উল্টো। প্রত্যেকটি সন্ত্রাসী গ্রুপের স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রে কেউ না কেউ আছে। আর যারা প্রভাবশালী, সত্যিকার অর্থে তাদের দল থাকে না।

বর্তমানে পত্র-পত্রিকায় যেসব সন্ত্রাসী ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেশি যুক্ত সরকারি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিএনপি বা

www.pathagar.com

অন্যরাও যে যুক্ত নয় তা নয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেছে, যে দল সরকারে গেছে সে দলের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এর অনিবার্য উত্তর হচ্ছে, যেহেতু সরকার সব নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু এর সঙ্গে যারা আছেন তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করেন নিজ স্বার্থে। যেমন ধরা যাক, রুবেল হত্যার সঙ্গে জড়িত মুকুলি বেগম বা বুশরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে অভিযুক্ত কাদের। এরা কাজ করেছে ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং দল এগুলোর সঙ্গে যুক্তও নয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে দলের। এর একটি কারণ, এ ধরনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রভাবশালীদের তৎপরতা এবং দল কর্তৃক সঙ্গে সঙ্গে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া। শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যুক্ত, যাদের এখন উল্লেখ করা হচ্ছে গডফাদার হিসেবে। এক অর্থে বলা যেতে পারে, এই গডফাদাররা সুস্থ রাজনীতি দখল করে নিচ্ছে, সত্যিকার রাজনীতিবিদরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন এবং এ অবস্থা চলতে থাকলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও এক সময় সদিচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না এবং তা আমাদের কারো কাম্য নয়।

রাজনীতিবিদ/সন্ত্রাসীরা একটি বিষয় অনুধাবন করছে যে, এ সমাজে টাকার শক্তিই বেশি। এই টাকার কাছে সবাই জিম্মি। মন্ত্রী/আমলাদের জন্য টাকা রোজগারের সহজ উপায় ফাইল আটকে দেয়া। রাজনীতিবিদদের একাংশের সম্পদের উৎস হচ্ছে পরিবহন, নির্মাণ সেক্টর, দোকানপাট ও জমি দখল। প্রধান ব্যক্তির ক্যাডাররা এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের রক্ষা করতে আবার ব্যবহৃত হচ্ছে প্রভাবশালীদের টাকা। এ টাকাটা প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো ব্যবস্থা নিতে চাইলেও সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে ওঠে না। কারণ তখন নির্বাচনে টাকা যোগানোর প্রশ্ন ওঠে, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য টাকার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এগুলো যে ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয় সে প্রশ্ন কেউ তোলে না। এ সম্পদ কিন্তু অন্তিমে ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে ওঠে।

এ থেকে কি পরিত্রাণ নেই? না থাকলে এ বিষয়ে বক্তৃতা বা বিবৃতি বা লেখালেখি না করাই ভালো। আর যদি মনে করি পরিত্রাণ আছে তা হলে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা মনে করি, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সব সঙ্কট থেকেই পরিত্রাণের উপায় আছে।

সন্ত্রাস দমনে প্রধান হাতিয়ার পুলিশ। এ বাহিনীর একটা বড় অংশ যে নচ্ছার এ কথা কেউ আর অবিশ্বাস করে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন কিনা সন্দেহ। দৈনিক *ইত্তেফাকের* খবর অনুযায়ী পুলিশরা সদর দপ্তরের নির্দেশও উপেক্ষা করে। পুলিশের পক্ষেও নানা কথা আছে। তাদের অস্ত্র নেই, প্রশিক্ষণ নেই, থানাগুলোতে পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা ছাড়া এগুলোর সমাধান করা দুরূহ। অন্যদিকে, তারা কিছু কিছু সন্ত্রাসী তো গ্রেপ্তারও করছে এবং অভিযোগ উঠছে, আদালত তাদের জামিন দেয়। আদালতের ভাষ্য, চার্জশিটে ফাঁক-ফোকর থাকে এবং তা ইচ্ছাকৃত। এটি যেমন সত্য, তেমনি এটিও সত্য, কোনো কোনো আদালতে জানা সত্ত্বেও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন দেয়া হয়। নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রবল। এভাবে প্রশাসনের একটি বড় অংশ দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু এ অভিযোগও তো সত্য, পুলিশের একাংশের সঙ্গে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীদের যোগ আছে এবং তারা যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু এদের তেমন কোনো শাস্তি

www.pathagar.com

হয় না। তদন্ত কমিটি হয়। তারপর ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। বদলি কোনো শাস্তি নয়। যে সব পুলিশ অফিসার সম্পদের পাহাড় গড়েছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় না। শুধু পুলিশ কেনো, কোনো ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় না। ফলে চাকরিচ্যুত হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। তাহলে কেনো পুলিশ বা অন্যরা দুর্নীতি (সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত) করবে না? অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শাস্তি না দিয়ে পুরস্কৃতও করা হয়। মন্ত্রী/রাজনীতিবিদরা বলেন, এজন্য ব্যবস্থা দায়ী, যা তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সুতরাং এগুলো ঝামেলা। ঝামেলাটা হচ্ছে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট। ব্যবস্থা পরিবর্তনে আইন করুন। দায়ীদের দলমত নির্বিশেষে ত্বরিত শাস্তি প্রদান করুন। দেখুন ফল পাওয়া যায় কি-না। আদালতে প্রচলিত আইনে শাস্তি দেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকলে তা বদল করুন। মানবিকতার প্রশ্ন তুলে সন্ত্রাসীকে জামিন দেয়ার কথা তুললে তা সমাজে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাজনীতিবিদ যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদেরও কিছু হয় না। জননিরাপত্তা আইন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু প্রভাবশালী বা তাদের পুত্র বা ছাত্রলীগের ক্যাডার নেতাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় তা প্রয়োগ করা হয় না। ছাত্রলীগে যে হানাহানি চলছে (সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী), সে ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়? তা হলে সন্ত্রাস দমন হবে কীভাবে? আওয়ামী লীগের অনেক নেতা হয়তো টাকা ও ভোটের কারণে ভাবছেন এসব নিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেয়াই শ্রেয়। কিন্তু এর ফলে শহর অঞ্চলের ভোটারদের কাছে আওয়ামী লীগের অনেক অর্জন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং সবাই প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে আরো উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, দখল, চাঁদাবাজিতে যেসব নেতা, নেতাপুত্ররা জড়িয়ে পড়ছে তারা আওয়ামী লীগের জন্য ভোট আনবে না বরং ভার হয়ে দাঁড়াবে। যেসব মন্ত্রীপুত্রের কথা বার বার সংবাদপত্রে আসছে সন্ত্রাসের কারণে, সেগুলো সত্য হলে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের এমপি নির্বাচিত করতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে সত্যিকার অর্থে নির্দেশ দিতে হবে, প্রভাব ও আত্মীয়তা যেনো গ্রেপ্তারের প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ প্রায় প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতা (ছোট-বড় যাই হোক) জড়িত। তাদের শাস্তি দাবি না করে খালি পুলিশের শাস্তি দাবি করে কোনো লাভ নেই।

বলছিলাম, দুর্নীতিও এক ধরনের সন্ত্রাস। প্রধানমন্ত্রী অকপটে বলেছেন, তিনি নির্দেশ দিলেও দুর্নীতির কারণে তার নির্দেশ পালিত হয় না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে পালিত হয়নি সেক্ষেত্রে কি তিনি কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন? সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম, দুর্নীতি দমন বিভাগের ছয় কর্মকর্তা ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি নিয়েছিলো। তদন্তে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নির্দেশে তাদের পুনর্বহাল করা হয়েছে। খবরটি যদি সত্যি না হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে অবশ্যই এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আর যদি সত্য হয় তাহলে অনুমান করে নিতে পারি কেনো সন্ত্রাসী-দুর্নীতি চলবে, কেনো রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হবে না, কেনো অন্যান্য ক্ষেত্রে এতো কাজ করেও নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার সুফল হয়তো পাবে না। কেনো রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করা দুরূহ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২.৭.২০০০

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কি তৈরি হচ্ছে গৃহযুদ্ধের পটভূমি?

'মানুষ তা-ই পায় যা সে করে।' না, এ মন্তব্য আমার নয়। পবিত্র কোরানের আয়াত, সুরার নাম নজম্। এ কথা মনে হলো গত ৫০ দিনের পত্রপত্রিকা পড়ে। গতকাল পূর্ণ হয়েছে বিএনপি-জামায়াতের সরকার গঠনের ৫০ দিন। সরকার সংহতকরণের জন্য এই ৫০ দিন যথেষ্ট। কিন্তু কি দেখেছি গত ৫০ দিন পত্রপত্রিকায়? একদিকে আছে জোট সরকারের অতিদক্ষভাবে দখল সংস্কৃতি প্রচলন; অন্যদিকে দেশদ্রোহী খোঁজা, যার অন্য নাম শুদ্ধিকরণ অভিযান। বিএনপির চিন্তাটাঙ্কির একজন বলেছেন, 'নতুন সরকারের কাজে উন্নয়ন ভাবনার চেয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছাপই বেশি।' (*জনকণ্ঠ*, ১.১২.২০০১) এ প্রতিহিংসা যারা পরিচালনা করছে, কর্মফল কি তাদের তা-ই হবে?

'মোটর গ্যারেজে হামলাকালে যুবদল নেতা : খালেদা জিয়া আমার নেত্রী, আমি সবকিছু দখল করে নেবো।' (*সংবাদ*, ২২.১১.২০০১) না, এ ধরনের শিরোনামের সংবাদ আজকাল তিন-চারটি পত্রিকা ছাড়া অন্য পত্রিকা করে না। কারণ সৎ সাংবাদিকতার বিষয়টি আপেক্ষিক। যে মালিক বা সম্পাদক যা সৎ মনে করেন, তা-ই সৎ সাংবাদিকতা। এক সময় যেসব কাগজের সম্পাদকরা চোখ খুললেই আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস এবং বিএনপি-জামায়াতের শান্তি দেখতেন, তাদের কাছে এখন দু'মাসের পুরনো আফগান সঙ্কট প্রধান বিষয়। তাদের কাছে হিন্দু ও রাজনৈতিক কর্মী নির্যাতন অতিরঞ্জন। শাহরিয়ার কবির ঠিক ঠিকই র-এর এজেন্ট, দেশে এখন গিজগিজ করছে দেশদ্রোহী। আর সন্ত্রাস, ধর্ষণ তো এক-আধটু থাকবেই। নিউইয়র্কে নেই?

যাক, যা বলছিলাম। এই যুবদল নেতা রাজনীতি বোঝে না।। তাহলে সে বেগম জিয়ার নাম ধরে একথা বলতো না। বরং বলতো, শেখ হাসিনা আমার নেত্রী। সে জানে, তার নেত্রী ক্ষমতায় এসেছে এবং ক্ষমতায় যাওয়া মানেই দখল, লুট- প্রয়োজনে খুন। সে আরো দেখছে, শৌচাগার থেকে এমপি হোস্টেল সব দখল হয়ে যাচ্ছে। তার কী হবে? দখলের তো কিছু থাকছে না। সবাই দখলের জিনিস খুঁজছে। নেতাকর্মীরা সকাল হলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথচ সংসদে কোরাম হয় না। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু, আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়ে গেছে। হয়তো অচিরেই এরা তাদের নেতা-নেত্রীদের সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে। এ কারণেই কি পবিত্র কোরানে আছে- 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।' (সুরা শুরা)

বিএনপি-জামায়াতের বিজয়কে অনেকে বিচার করেছেন আওয়ামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের 'রায়' হিসাবে। মেনে নিলাম যে কথা। কিন্তু পত্রিকাগুলো তাহলে এখনো কেনো লিখছে :

১. 'বিপজ্জনক হয়ে উঠছে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। নভেম্বর মাসে রাজধানীতে ৪৯ খুন। ৩শ' ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় দেড় কোটি টাকার মালামাল লুট।' (*আজকের কাগজ*, ১.১২.২০০১)

২. 'জোট সরকারের ক্যাডারদের চাঁদাবাজি সন্ত্রাসের কাছে দুই সহস্রাধিক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান জিম্মি।' (*জনকণ্ঠ*, ১.১২.২০০১)

www.pathagar.com

৩. 'চট্টগ্রামের কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি, ছিনতাই, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা থাকলেও তারা আইনের ফাঁকফোকর গলে দিব্যি জেলখানা থেকে জামিনে বের হয়ে আসছে।' (*ভোরের কাগজ*, ২৮.১১.২০০১) সে জন্যই কি প্রতিদিন পত্রপত্রিকায় দেখি খুন আর খুন আর ধর্ষণের কাহিনী? সমাজে বিএনপি-জামায়াত আমলে এই যে ফিৎনা বা চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তার কী হবে? আল্লাহ ফরমায়েছেন, 'ফিৎনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক।' (সুরা বাকারা) তাদের ভাষায়, মানুষের ম্যান্ডেট কি ছিলো এই ফিৎনা সৃষ্টির জন্য?

জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায়। সুতরাং বাংলাদেশ আর কোনো মতাদর্শ থাকতে পারে না। এ আদর্শ সামনে রেখে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ, বিশেষ করে প্রশাসনে। সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে :

১. 'পুলিশের ৩১ জন ওএসডি।' (*ভোরের কাগজ*, ২৯.১১.২০০১)

২. 'ওরা সংখ্যালঘু ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তাই বাতিল করা হচ্ছে এনএসআইয়ের ৬৫ উপ-সহকারী পরিচালকের নিয়োগ।' (*জনকণ্ঠ*, ২৭.১১.২০০১)

৩. 'বিদেশে উচ্চশিক্ষারত ৬৮ জনকে পাঠানো হয়েছিলো পরিকল্পনা প্রণয়নে সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে।' এখন তাদের ফেরত আনা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে (ঐ)।

৪. 'দেড় মাসে ৭ শতাধিক বদলি।' (*ভোরের কাগজ*, ২৫.১১.২০০১)

৫. '৭৩ ব্যাচের সকল মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাকে বিদায় দেয়া হবে।' (*সংবাদ*, ২২.১১.২০০১) এবং পরশু ১৯ জনকে বিদায় দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ডিসির মতো সব ভিসি বদল করা হয়েছে। এমনকি পিতা আওয়ামী লীগের হওয়ার কারণে ক্রিকেট দলের ম্যানেজারও বাদ পড়েছেন। গত পাঁচ বছরে স্থাপিত ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধেও পরোক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বাকি আছে ফকির-ফাকরারা।

প্রথম ব্যাচের (৭৩) সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়া কি অপরাধ ছিলো? এখন দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা চাওয়াটাই ছিলো মুখ্য অপরাধ। মধ্যযুগের পাকিস্তান ছিলো ঢের ভালো। আওয়ামী লীগের আমলে যাদের চাকরি হয়েছে, সবাই আওয়ামী লীগার? বিএনপি আমলের কর্মকর্তারা বিএনপির? এ তো উন্মাদের মতো আচরণ। এ যুক্তি অনুসারে কেবিনেট সচিব আকবর আলী খান থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগ আমলে যারা সচিব হয়েছিলেন, তারা আওয়ামী লীগার। বিএনপি আমলেও তারা আছেন। এর অর্থ কি বিএনপির সঙ্গে তাদের কোনো লেনদেন হয়েছিলো? এ রকম যুক্তি তৈরি হলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বলে কিছু থাকবে না। সব চাকরিই চুক্তিভিত্তিক হতে হবে। যাদের আজ বিভিন্ন জায়গায় বসানো হচ্ছে, তারা চিহ্নিত হচ্ছেন হাওয়া ভবনের খাস লোক হিসেবে। এভাবে তাদের ক্যারিয়ার বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে উচ্চপদস্থ কয়েকজন সচিব। এরা কয়েকদিন পর চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা পড়বেন প্রতিহিংসার কবলে। আমি মনে করি না সিভিল সার্ভিসে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের সবার রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে বা সবাই চাকরিতে থেকে রাজনীতি করেন। যারা আজ উল্লসিত সাড়ে সাতশ' ওএসডি বা চাকরিচ্যুত হওয়াতে, তাদের অনুরোধ জানাবো কোরানের এই আয়াতটি স্মরণ করতে- 'পবিত্র মাসের বদলে পবিত্র মাস ও সকল পবিত্র জিনিসের জন্য এমন বিনিময়। সুতরাং যে তোমাদের আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।' (সুরা বাকারা)

www.pathagar.com

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এখন দেশদ্রোহী খোঁজা হচ্ছে। পত্রিকার ভাষায়- 'এবারের টার্গেট মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।... তালিকাভুক্তদের হত্যা, গুম থেকে শুরু করে মিথ্যা মামলায় জড়ানোসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করার জন্য নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে।' (*জনকণ্ঠ*, ১.১২.২০০১) এই নীলনকশার প্রথম শিকার শাহরিয়ার কবির। দেশদ্রোহী হিসেবে দ্বিতীয়বার যার বিরুদ্ধে মামলা করা হলো, তাঁর সম্পর্কে এক চিঠি লিখেছে নেদারল্যান্ডসের রয়াল একাডেমির সঙ্গে যুক্ত ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল হিস্ট্রি। বেগম জিয়াকে পাঠানো চিঠিতে তারা উল্লেখ করেছে— 'মি. কবির ডিজার্ভস হিজ কান্ট্রিস রেসপেক্ট রাদার দ্যান সেনশিউর ফর হিজ অ্যাক্টিভিটিজ ইন সাপোর্ট অব জাস্টিস, ফ্রিডম অব স্পিচ অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস...' আর এদেশের কুৎসা রটনাকারী, জেনারেল এরশাদের সেই 'দাড়িঅলা খচ্চর'র পত্রিকা *ইনকিলাবে* প্রতিদিন গিবত গাওয়া হচ্ছে শাহরিয়ারের এবং অন্যান্যের। এসব সংস্কৃতিসেবী নাকি সব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে মাসোহারা পায়। এ চরিত্র হননের বিরুদ্ধে কোনো বিচার নেই। সাংবাদিকরাও কখনো এ ধরনের সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। আমরা অসহায় এ কারণে যে, আমাদের পিছনে রাজনীতিবিদ, ভণ্ড মওলানা, ঋণখেলাপি শিল্পপতি, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র নেই। অবশ্য আল্লাহ ঘোষণা করেছেন— 'মোনাফেকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো, এরপর এ শহরে তারা তোমার প্রতিবেশীরূপে কমই থাকতে পারবে। তারা হবে অভিশপ্ত, ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।' (সুরা আহসাব) আল্লাহ মেহেরবান। আমরা তার দিকে তাকিয়ে আছি যাতে ইবলিশের হাত থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

লতিফুর-মুয়ীদ গং হিন্দু ও আওয়ামী লীগ সমর্থক নিশ্চিহ্নকরণে যে প্রোগ্রাম শুরু করেছিলো, তা পরিপূর্ণতা পেয়েছে চার জোটের আমলে। বিচারপতি হিসেবে পরিচিত লতিফুর রহমানের সময় নির্বাচনের একটি ঘটনা ছেপেছে ইন্ডিয়া টুডে। দিনাজপুর-২ নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী সতীশচন্দ্র রায়, যিনি এর আগে চারবার জিতেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির জেনারেল মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সেনাপতি। নির্বাচনের দিন জেনারেল তার সমর্থকদের নিয়ে রাজবংশীদের গ্রাম ঘিরে ফেলেন এবং ঘোষণা করেন, পুলিয়ারা (হিন্দু রাজবংশীদের এ নামে ডাকা হয়) ভোট দিতে গেলে কল্লা ফেলে দেয়া হবে। পুলিয়ারা এ কথা শুনে পগার পার। বিএনপির মাহবুবুর রহমান জয়ী। অবশ্য আমাদের জেনারেলরা সব সময় নিরস্ত্রদের ওপর স্টিমরোলার চালিয়েই জিতেছে। নির্বাচনে এম. এ. সাঈদের দুষ্টু ছেলেরা তো ছিলোই আর ছিলো আর্মিরা। মাহবুবুর রহমান এ কাজ করতে পারেন ভাবতে পারি না। তার উচিত এ খবরের প্রতিবাদ করা এবং ইন্ডিয়া টুডের সম্পাদককে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তারের আদেশ দেয়া। বাংলাদেশ ও ভারতে তো এখন খুব একটা তফাত নেই। ভারত এ অনুরোধ রাখবে।

তা লতিফুর-মুয়ীদ-সাঈদের পর এসেছেন তেনারা এবং গ্রামবাংলা আজ ১৯৭১। আগে ছিলো খানসেনারা ও রাজাকাররা। এখন বিএনপি ও রাজাকাররা। ইয়াহিয়া খান বলেছিলো, কতল কর হিন্দু আর আওয়ামী লীগকে। বিএনপিও বলছে, কতল কর হিন্দু আওয়ামী লীগারদের। পার্থক্য মাত্র ৩০ বছরের। চারদিকে এখন ধর্ষিত রমণীর আর্তনাদ, ঘরছাড়া গৃহস্থের

www.pathagar.com

হাহাজার, আহত-নিহত পরিবার-পরিজনের আহাজারি। জানি না আল্লাহর আরশে তাদের কান্না পৌঁছায় কি-না। আল্লাহ বলেছেন, 'আর তাদের জন্য তার মধ্যে (তওরাত) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত আর জখমের সমান জখম।' (সুরা মায়িদা) তবে আমরা বলবো, আল্লাহর কথা মনে রেখে ধৈর্য ধরুন যিনি বলেছেন, 'অবশ্যই অত্যাচারীদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।' (সুরা আল-ই-ইমরান) ...আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।' (ঐ) যেসব ঘটনার উল্লেখ করলাম, এগুলো সবই উদাহরণ প্রতিহিংসার। 'ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকার ১০০ দিনের ঘোষিত কর্মসূচির পরিবর্তে প্রতিশোধস্পৃহায় অঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ঝড়ো গতিতে।' (*জনকণ্ঠ*, ১.১২.২০০১) প্রতিহিংসা প্রতিহিংসাই ডেকে আনে। যারা অত্যাচারিত হচ্ছে, একসময় তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা জেগে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্বৈরাচারী এরশাদ আমলের কথা মনে পড়ছে। একজন রাজনীতিবিদ বলেছিলেন, সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের দমন করা হচ্ছে, তারা সংখ্যায় কয়জন? তাদের পরিবারের সবাই কি আর্মির? মানুষ ক্ষিপ্ত হলে তাদের ওপর হামলা হবে না কে বললো? তো মানুষ তো মানুষ। প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠলে কী হবে? এ ধরনের হামলা প্রতিহামলা শুরু হলে তা গড়াবে গৃহযুদ্ধে। এই ফিৎনার জন্য কে দায়ী হবে? চারদলীয় জোটের পর যারা ক্ষমতায় আসবে, তারা কি পারবে তাদের অনুসারীদের দমাতে? চেষ্টা করলেও পারবে কি-না সন্দেহ। আমাদের অনেকেও হয়তো বলি হবো সেই গৃহযুদ্ধে। ওই পরিস্থিতিতে আমরা শুধু বলবো স্মরণ করুন আল্লাহকে যিনি বলেছেন— 'আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মন্দের প্রতিফল মন্দ আর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।... কেউ ধৈর্য ধারণ করলে আর ক্ষমা করলে তা হবে স্থৈর্যের কাজ।' (সুরা শুরা)

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২.১০.২০০১

www.pathagar.com

কাফ্ফারা সবাইকে দিতে হবে আগে অথবা পরে

ছবিটি অনেকে দেখেছেন, *জনকণ্ঠ* বা *সংবাদের* পাতায়। *সংবাদের* প্রথম পৃষ্ঠার ওই ছবিটি পূর্ণিমার, যখন চোখে পড়লো সকালে, তখন আপনা-আপনি চোখে পানি চলে এলো। কিন্তু কেনো? এতো বছর— এতো বিপর্যয়, এতো হুমকির মুখেও তো কখনো বিপর্যস্ত বোধ করিনি। খানিক পর অনুধাবন করলাম, আমারও একটি মেয়ে আছে পূর্ণিমার বয়সী এবং আমি ভেবেছিলাম, এই ছবিটি তো আমার মেয়েরও হতে পারতো। তার পর সারাদিন, ফোন পেয়েছি অনেক, রাস্তাঘাটে কথাবার্তা হয়েছে অনেকের সঙ্গে। প্রায় সবাই বলেছেন, মেয়েটি তো আমার মেয়ে বা আমার বোন হতে পারতো। যারা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ছিলেন, তাদের অনেকে সমষ্টিগত ডিপ্রেশনে ভুগছেন। পূর্ণিমার একটি ছবি- মুখঢাকা দু'হাত দিয়ে, কিন্তু কী সাহস এসে হাজির হলো আমাদের সামনে, যেনো চড় মেরে গেলো বাংলাদেশকে। আমরা কেউ তা বুঝিনি। আজ মধ্যবয়স শেষে মনে হয়েছে, এতো দেশ থাকতে কেনো বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলাম? না, এটা আপনাদের কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, এটি নিজের খেদোক্তি মাত্র।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও দৈনিক পত্রিকায় ঠিক এমন একটি ছবি বেরিয়েছিলো। মুখঢাকা কিশোরীর। সে ছবি দেখেও অনেকে কেঁদেছিলো। পাকি কর্তৃক ধর্ষিত বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছবি। কোনো অমিল নেই ছবি দুটির। পাঞ্জাবি পাকি নেই বটে, কিন্তু তাদের সহযোগী, প্রত্যক্ষ সহযোগী অনেকের বাড়ি-গাড়িতে এখন বাংলাদেশের পতাকা। অনেকে আওয়ামী বিরোধিতায়, প্রবল প্রতিহিংসার কারণে এসব ভুলে গেছেন। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যে, না এগিয়ে পিছিয়েছি এটিই তার প্রমাণ। পাকিস্তান করে কি কোনো লাভ হয়েছিলো আমাদের? বা হবে কখনো? ১৯৭১-এ পাকি সেনাদের টার্গেট ছিলো সব বাঙালি, নির্দিষ্টভাবে হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দু তখন পালিয়েছে, অনেকে নাম ভাড়িয়ে থেকেছে। মুসলমানদেরও তথৈবচ অবস্থা। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে— তুম মুক্তি হ্যায়, আওয়ামী হ্যায়? কারণ, তা হলেই সে হিন্দু নাম মুসলমান হতে পারে। তবে মুসলমান বলে পার পেয়ে গেছেও অনেকে, হিন্দুরা পায়নি। সে সময় পাকি সেনা সরকার বলেছিলো, এ ধরনের সংবাদ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা (দি এলিগেশন অফ ডেলিবারেট একসপালশন অফ পিপল ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান থ্রু এ ক্যাম্পেইন অফ টেরর ইজ টোটালি ফলস, ম্যালিশাস অ্যান্ড আনওয়ান্টেড; ১.৬.১৯৭১) বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই সুরে একই কথা বলেছেন, 'সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ব্যাপারে পত্রিকাগুলো অতিরঞ্জিত খবর ছেপেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ৮০/৯০ ভাগ ভিত্তিহীন। খবরের কাগজের রিপোর্টের সঙ্গে ডিসি-এসপিদের পাঠানো রিপোর্টের কোনো মিল নেই।' [*সংবাদ* ১৬.১০.২০০১] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন প্রাক্তন সৈনিক এবং জেলা প্রশাসনের প্রধানরা নিয়োজিত লতিফুর-মুয়ীদ চৌধুরীর দ্বারা।

১৯৪৭ থেকে হিন্দু নির্যাতনের শিকার। সব সময় দাঙ্গায় তাদের সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ওপর হামলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে তা চরমে ওঠে। তার পর থেকে হিন্দুরা কখনো নির্যাতিত হয়নি- এ কথা বলা সত্যের অপলাপ। আওয়ামী, বিএনপি, জাতীয়, সামরিক— সব আমলেই হিন্দুদের বেছে নেয়া হয় শিকার হিসেবে। তারা ঠিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না। তারা হিন্দু বা সংখ্যালঘু। ১৯৭১-এর পর্যায়ে মিলটা আসছে এখন, যা শুরু করেছিলো ঠিক পূর্ববর্তী সরকার। বর্তমানে সেটা চরমে উঠেছে। হিন্দু এবং আওয়ামী লীগের সবাই মার

www.pathagar.com

খাচ্ছে। কারণ হিন্দু ও আওয়ামী লীগ ও হিন্দু ভারত তাদের ধারণায় এক। অন্তত আওয়ামী লীগ বিরোধীদের ভাষ্য তাই। এটি ঠিক হলে বলতে হয়— গৌতম চক্রবর্তী, গয়েশ্বর রায় বা নিতাই রায়রা হিন্দু নয়। বিএনপি-জামায়াত একটি কথাও বলেনি ভারতের বিরুদ্ধে, যা ত্রিশ বছরে অভূতপূর্ব ঘটনা। এবং বলা হচ্ছে এখন ভারতে গ্যাস বিক্রি হবে। তা হলে বিএনপি-জামায়াত হিন্দু ভারতের দালাল? যে মুসলমানরা এদের সমর্থন করছে, তারাও কি মীর নাসিরের ভাষায় 'ভারতীয় রাজাকার?' এখন যেমন আওয়ামী ও হিন্দুদের পিটানো হচ্ছে, তাদেরও কি সেভাবে পিটাতে হবে? শিক্ষিত, ভালো কাপড়চোপড় পরা ওসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচক স্মার্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বক্তব্য এখন কী?

ইউরোপীয় কমিশন আবার বেশ খানিকটা ইয়ার্কি করেছে। 'সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন বা প্রতিশোধমূলক আক্রমণ থেকে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরত রাখার জন্য তিনি (প্রতিনিধি) বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অনুরোধ করেছেন।' (*জনকণ্ঠ* ১৪.১০) কিন্তু কেনো? আসলেও কিছু ঘটছে কি? আগে, নির্বাচনের সময় ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াও কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে বিরত থাকার জন্য। নির্বাক প্রেসিডেন্ট হঠাৎ জনাব মান্নান ভূঁইয়াকে ডেকে নির্দেশ দিলেন সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য— যা তিনি পারেন না। তার ক্ষমতা ছিলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যা তিনি করেননি। আর তাদের কথাবার্তা শুনে ও পত্রপত্রিকা থেকে মনে হয় নির্যাতন হচ্ছে, কিন্তু আলতাফ হোসেন চৌধুরী যে বলছেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা বিক্ষিপ্ত, ছিটেফোঁটা' (*জনকণ্ঠ* ২১.১০) তা হলে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা সত্য নয়। আর ডি সুজা তো ইয়ার্কি করছেন। কারণ, নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন হামলা-মামলা চোখে পড়েনি, এখন পড়লো। হিন্দুরা, আমার ব্যক্তিগত মত, যদি পারে দেশ ছেড়ে চলে যাক। আর যদি যেতে না চায়, কারো দিকে প্রত্যাশা না করে নিজের পায়ে দাঁড়াক। বাংলাদেশে কেউ কাউকে সাহায্য করে না, নিজেকে ছাড়া। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে বলেছিলেন, সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার ব্যাপারে কোনো ইতস্তত করা উচিত নয়, তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে, কারণ তারা পাকিস্তানের একই ধরনের নাগরিক। 'দে উইল বি গিভেন ফুল প্রকেটশন অ্যান্ড এভরি ফ্যাসিলিটি অ্যাজ দে আর ইকুয়েল সিটিজেন অফ পাকিস্তান অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অফ অ্যানি ডিসক্রিমিনেটরি ট্রিটমেন্ট।' (১৯.৬.৭১) পেয়েছিলো কি? আমার ব্যক্তিগত মত, হিন্দুদের যদি থাকতে হয় তা হলে তাদের ভোটাধিকার রহিত করা হোক। তা হলে আওয়ামী লীগও শায়েস্তা হবে এবং তাদের ওপর জিজিয়া কর বসানো হোক যা অনেক মুঘল সম্রাট বসিয়েছিলেন। তাতে যে অর্থ আসবে তাতে বাজেট ঘাটতি ঠেকানো যাবে। অথবা তাদের ভারতে যেতে দেয়া হোক এবং ভারতীয় মুসলমানদের বদলে বাংলাদেশে আনা হোক, তাতে বাংলাদেশের মুসলমানদের আপত্তি হওয়ার কথা নয় এবং এতে জামায়াত-বিএনপির ভোটব্যাংকও বাড়বে। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে ভারতীয় মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেনি। না হলে এই হিন্দু ফ্যাক্টর সব সময়ই ঝামেলা বাধাবে।

আওয়ামীবিরোধী এক বন্ধু আমাকে পূর্ণিমার ছবিটি দেখে বলেছিলেন, এগুলো কি হচ্ছে? তিনি কোথায় খবরটি পেয়েছিলেন জানি না। কারণ তিনি *ডেইলি স্টার* ও *ইনকিলাব* পড়েন। হয়তো *জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ* বা *সংবাদের* কোনো পাঠক তাকে বলেছিলো। আমি বললাম, যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। তিনি বললেন, মানে? মানে নির্বাচনটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধীদের যুদ্ধ। তখনো যেমন মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের যুদ্ধ হতো, সে রকম যুদ্ধে পরাজিতরা হচ্ছে গনিমতের মাল। তো আজ বিএনপি ক্ষমতায়; আওয়ামীরা

www.pathagar.com

পরাজিত। তাদের ও হিন্দুদের ঘর-সম্পত্তি বৌ-বাচ্চা সব গনিমতের মাল। আবার কখনো আওয়ামী লীগ এলে অন্যদের তা-ই মনে করবে। তার বোধ হয় এ নিয়ে একটু সন্দেহ হচ্ছিলো। ওই আর কি মানবিকতাবোধ ছিলো। আমি বললাম, আমার ধর্মে যদি এটা বৈধ না হয় তাহলে যে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমান, তারা প্রতিবাদ করে না কেনো? কোনো মুসল্লি, আল্লাওয়ালা এর প্রতিবাদ করেছেন?

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের মুসলমানরা তো লাদেনের হয়ে লড়বে বলেছিলো। জামায়াত তো জান কুরবান করেছিলো। কিন্তু লাদেন তো প্রায় শেষ। পথে দেখি আমিনী-নিজামী কেউ নামে না। স্মার্ট ড্রেসের মুসলমানরাও— যারা মনে করে হিন্দু আওয়ামীদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, তারাও চুপচাপ। সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন— 'নিশ্চয়, যারা বিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথে স্বদেশ ত্যাগ করে ও জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর দয়ার আশা রাখে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' আমাদের মতো ভণ্ড আর কই পাবেন? শাবানা আজমী কয়েক দিন আগে ভারতে বলেছিলেন, এতো জিহাদের ডাক দেন দিল্লী জামে মসজিদের ইমাম, কিন্তু যান না তো। তাকে প্যারাসুটে করে কাবুলে ফেলা উচিত। শাবানা জানেন না, আমাদের এখানকার অনেকের মত যে, মুরগি খেয়ে, ঘুম থেকে উঠে ধর্মের নামে মিছিল করে জিহাদ ডাকা আরামের। ধর্মকর্মও হয়, নিরাপদেও থাকা যায়। কাবুলে তো গুলিগালা। খাওয়া পাওয়া যায় না। আর মরে গেলে ধর্মকর্ম করবে কে?

১৯৭১ সালে আগস্টেই পাকি সরকার আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করেছিলো 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য।' আজ দেখলাম, সরকার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার বিদেশ যাওয়ার ওপর। দেশে যা চলছে তা চলবে, বাড়তেও পারে। এর জন্য কাউকে অভিযুক্ত বা দোষী করছি না। সে সাহস বা ক্ষমতাও আমার নেই। আমি নিজে যে জাতির অংশ, সে জাতি সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা আছে। এক হাজার বছরের ইতিহাসে এ জাতিকে কেউ নন্দিত করেনি। ১৯৭১ সাল ছাড়া। সেটি ব্যতিক্রম। আমাদের এক পুরনো সাংবাদিক বন্ধু আবু সালেহ বোধহয় খুব সম্ভব একটা ছড়া লিখেছিলেন, 'রক্ত দিয়ে পেলাম শালা এমন স্বাধীনতা।' তিনি অনেক আগে এটি বুঝেছিলেন, আমরা অনেকে বুঝিনি। তবে এতোটুকু বুঝেছি, আল্লাহ বলেন, ভগবান বলেন, গড বলেন, তাতে বিশ্বাস রাখেন কী না রাখেন, মানুষের চোখের জলের একটি অভিশাপ আছে। আওয়ামী লীগ যদি মানুষের চোখের জলের কারণে চলে গিয়ে থাকে তাহলে আজ যারা আছে তারাও ওই পথে যাবে। পূর্ণিমার ছবিটি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন, তারপর কন্যাকে আদর করে স্ত্রী নিয়ে পার্টিতে যেতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনাকে একটি কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, আমরা এমন অনেক কথা বলেছি যা রাখিনি। শপথ করে কথা না রাখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে (সুরা মায়িদা)। এরপর আমার আপনার স্ত্রীকে যখন অপহরণ করা হবে, কন্যাটিকে তুলে নেয়া হবে, বোনটিকে গায়েব করে দেয়া হবে, তখন বুঝবেন পূর্ণিমা আসলে কি বলতে চেয়েছিলো।

জনকণ্ঠ, ২৪.১০.২০০১

www.pathagar.com

মুরগি চুরির ঘটনায় জাতি লজ্জিত হবে কেনো?

উমা মুহুরী এ কাজটি কেনো করলেন বুঝলাম না। নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর লাশ ঢাকা দেয়ার জন্য চাদর খুঁজছিলেন বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরী। উমা কাপড় তো দিলেনই না; বরং তাকে বললেন, 'কাপড় দিয়ে বীভৎসতা ঢাকার দরকার নেই, আপনাদের সরকারের আমলে জনগণের নিরাপত্তা কতোটুকু আছে, দেশবাসী দেখুক।' (*সংবাদ*, ১৭.১১.০১)। তার সঙ্গে আরেকজন মন্ত্রী জনাব নোমানও ছিলেন। অন্যরা আসার আগে লাশটি ঢেকে ফেললে ভালো হতো। আলতাফ চৌধুরী তাহলে বলতে পারতেন, ঘটনাটি ঘটেনি।

নোমান বলতে পারতেন, বিষয়টি অতিরঞ্জিত। পুলিশ বলতে পারতো, এ রকম ঘটনা ঘটেছে কি-না। যেমন আওয়ামী আমলে ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে লাশ পাওয়া গেলে সবাই ধরে নিয়েছিলো কাক সেটা ফেলে গেছে। আরো মুশকিলে পড়েছে ইনকিলাব ও 'প্রগতিশীল' পত্রিকাগুলো, তারা প্রথম পাতায় বাধ্য হয়ে খবরটি ছেপেছে। সাধারণত আফগানিস্তানই প্রাধান্য পায় বাংলাদেশে। অন্য খুনোখুনি বা টেররিজম নয়। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন। নয়তো ইনকিলাব যেমনটি ইঙ্গিত করেছে, তেমন করে বলতো, ছাত্রলীগ ঘটনার জন্য দায়ী। উমা দেবী আপনি এতো লোককে বিব্রত করেছেন। তার ওপর আপনি মুসলমান নন। থাকেন চট্টগ্রামে, যেখানে মন্ত্রী সংখ্যা শুনেছি ছয়-সাতজন এবং সবাই বিশ্বাস করেন গত ৩০ দিনে যা ঘটেছে সবই অতিরঞ্জিত, সেখানে আপনি এ কাণ্ডটি না করলেই পারতেন। এখন বিমান সেনা চৌধুরীর দোস্ত, প্রাক্তন সৈনিক ও বর্তমান পুলিশ প্রধান তদন্ত শুরু করতে হয়তো বাধ্য হবেন এবং পুলিশি তদন্ত বোঝেন? দেখা যাবে, মেয়র মহিউদ্দিন বা বিপ্লবী বিনোদ বিহারী হয়তো এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। জানি না, উমা মুহুরী থাকতে পারবেন কি-না সে এলাকায়। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে নিবেদন, সংবাদের এ রিপোর্টটি যারা করেছেন তারা মুসলমান নন, সুতরাং আপনি বা আপনার সরকার তা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

সমস্যা বাধিয়েছেন ওই এলাকার লোকজনও। মন্ত্রীরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুকরণে জনগণকে বলছিলেন, 'সন্ত্রাসীরা যে দলেরই হোক তারা রেহাই পাবে না। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা হবে।' এলাকার লোকজনের উচিত ছিলো একথা বিশ্বাস করা। কিন্তু কেনো যেনো 'হাজার হাজার জনতা রোষে ফেটে পড়েন। তখন বিক্ষুব্ধ জনতা স্লোগান দেয় ও জুতা-স্যান্ডেল প্রদর্শন করে।' (*আজকের কাগজ*, ১৭.১১.০১)

বিএনপি-জামায়াত জোট ও পুলিশ যখন বেয়াদব জনতার (!) খোঁজ করবে তখন এ জনতা থাকবে? তাদের অনেককেই তখন অপরাধী হিসেবে চালান দেয়া হতে পারে।

ভুল করলেন বিনোদ বিহারী চৌধুরীও। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যোগ দেন, তখন আলতাফ চৌধুরীরও জন্ম হয়নি। আলতাফ চৌধুরীরা এসব ব্যক্তিকে চেনেনও না। সেটিই ভালো ছিলো। এখন এই নব্বই বছর বয়সে কে বলেছিলো আপনাকে এতো বড় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখের ওপর বলতে, 'আপনি দেশের সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ঘটনাগুলো সংসদে অস্বীকার করেছেন, মীরেরসরাইর দাশপাড়ায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবকে সংসদে বক্তৃতা দিয়ে

www.pathagar.com

বলেছেন মুরগি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাশপাড়ার ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনাটিও মুরগি চুরির ঘটনার মতো হবে কি-না জানি না।... আমরাও সংসদ সদস্য ছিলাম। সংসদে অসত্য কথা বলা অন্যায় বলে জানি...।' (ঐ)

জনাব আলতাফ চৌধুরী, অনুগ্রহ করে শ্রী চৌধুরীর কথায় কান দেবেন না। বৃদ্ধ মানুষ উত্তেজিত হয়ে কী বলে ফেলেছেন। আপনাদের ক্যাডারদের যদি একটু জানিয়ে দেন যে, বিনোদ বাবুর গায়ে যেনো হাত না তোলে, তাহলে ভালো হয়। দেখছেনই তো তারা পুরো দেশকে কেমন লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। বিনোদ বাবু কিন্তু কোনো দল করেন না। উনি তো আর জানেন না আজকের রাজনীতির মূলই হলো মিথ্যা বলা! চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস আবার জনাব আল নোমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনারা কি দেশে কোনো মুক্তিযোদ্ধার চিহ্ন রাখবেন না?' [*আজকের কাগজ*] একজন সাংবাদিক হয়ে তিনি কিভাবে এ প্রশ্ন করলেন জানি না। জামায়াত-বিএনপি সরকার গঠনের পর তারা মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় করেছে। মুক্তিযোদ্ধা না থাকলে এ মন্ত্রণালয় কী করবে? মুক্তিযোদ্ধা থাকবে তবে তাদের হতে হবে জামায়াত-বিএনপি ঘরানার।

আসলে সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লতিফ-মুয়ীদ কোম্পানি যখন জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানের পটভূমিকা তৈরি করেছিলো [যা হয়েছিলো পুরনো যুগোস্লাভিয়ায়], তখন কি অনেকে মনে করেননি এটি অতিরঞ্জন? তার পর নির্বাচনে যখন রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন মিলে ম্যান্ডেট দিলো জামায়াত ও বিএনপিকে তখনো তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। 'প্রগতিশীল পত্রিকাগুলো' ও ইনকিলাবও বলেছে এগুলো ঠিক নয়। নির্বাচনের সময় নাকি এম. এ. সাঈদের 'দুষ্টু'গুলো চলে গিয়েছিলো। নির্বাচনের পর আবার তারা ফিরে যখন লতিফ-মুয়ীদের আরদ্ধ কাজ সমাপন করছে, তখন সাঈদ বলেছিলেন নির্বাচনের পর এ রকম এক-আধটু হয়। সুতরাং অধ্যক্ষ মুহুরীর নিহত হওয়াটা সেভাবে দেখুন। ক্ষমতায় গেছে বিএনপি ও পঞ্চাশ বছরের জামায়াত প্রথম। তারপর আনন্দ-উদ্দীপনায় এ রকম এক-আধটু হবেই। তার ওপর তিনি মুসলমান ছিলেন না। হিন্দু বা আওয়ামী সমর্থক মারা গেলে এতো মাতমের কি আছে?

আলতাফ চৌধুরী এতোদিন যা বলেছেন আমরা সেটা বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করার হুকুম আছে। *জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ* বিশ্বাস করে না। কারণ তারা শেখ হাসিনার পক্ষ, তাদের মালিকরা/সম্পাদকরা শক্তিশালী। আমরা ছাপোষা, আমরা বাঁচতে চাই। আলতাফ চৌধুরী আগে বলেছেন, তিনি উল্কার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। কই হিন্দু ও আওয়ামী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ তো চোখে পড়েনি। মীরেরসরাইর ঘটনা মুরগি চুরি থেকে উদ্ভূত। এটিও আমরা বিশ্বাস করি। আমরা ছাপোষা মানুষ। আমরা গুলি খেতে চাই না। 'হাসিনা কণ্ঠ' বলে পরিচিত কয়েকটি পত্রিকা লিখেছে, এ হত্যা নাকি শিবিরের লোকজন করেছে। আমরা তা বিশ্বাস করি না। কারণ *ইনকিলাব* ও প্রগতিশীল পত্রিকাগুলোতে (সমালোচকদের ভাষায় 'খালেদা কণ্ঠ') তা লেখেনি। সরকারি মুখপত্রগুলো যা বলে না তা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, আসলে ঘটনাটা হয়েছিলো মীরেরসরাইতে কয়েকজন হিন্দু কয়েকজন হিন্দুর মুরগি চুরি করে। এর ফলে কলহ, সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বিএনপি-জামায়াতের কর্মীরা হিন্দুদের এ সংঘাত থামাতে গিয়েছিলো। যাক, যাদের মুরগি চুরি হয়েছিলো তাদের মনে হয়েছিলো নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী এতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। তিনি আবার বাম দল করেন।

www.pathagar.com

বাম দল আবার হরতাল ডেকেছিলো ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রির উছিলায় বিএনপি-জামায়াতের দেশ বিক্রির প্রতিবাদে। এতে আরে দল হিন্দু ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কারণ দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে তারা যাবে কোথায়? এ হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। পত্রপত্রিকা যাই বলুক, আমরা এটাই বিশ্বাস করি। আমাদের যেনো গুলি করা না হয়। শুনেছি অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী, সরকারি কর্মচারি, সাংবাদিক— সব মিলিয়ে হাজারতিনেক জনের একটি লিস্টি দেশের ভবিষ্যৎ এক তরুণ নেতা আপনার কাছে পাঠিয়েছে টাইট দেয়ার জন্য। সে জন্যই এ কথা বার বার বলছি। আপনারা যা হুকুম করছেন আমরা তাই বিশ্বাস করি।

আলতাফ চৌধুরী হঠাৎ বলে ফেলেছেন, 'নির্মম এ ঘটনার জন্য আমি লজ্জিত, সরকার লজ্জিত এবং জাতিও লজ্জিত।' আলতাফ চৌধুরীও বিনোদ বিহারী চৌধুরীর মতো ভাবাবেগে এ কথা বলে ফেলেছেন। কেনো তিনি, সরকার এতে লজ্জিত হবে? গত তিন মাসে কি হাজার হাজার মানুষ জাতিগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধির কারণে গৃহহারা হয়ে এলাকা ত্যাগ করেনি, বাঙালি নারীরা কি ধর্ষিত হয়নি? কয়েকদিন আগেও চাঁদপুরের কুচুয়ায় একজন হিন্দু রমণীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে ফেলে দেয়া হয় কচুয়ার রাস্তায়। পুলিশ তো মামলাও করেনি। আওয়ামী লীগ পাঁচ বছরে যা করতে পারেনি জামায়াত-বিএনপি ৩০ দিনে তা সমাপন করে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এতে লজ্জিত হওয়ার কী আছে? আর এ জাতিও বা লজ্জিত হবে কেনো? একটি মুরগি চুরির ঘটনায় একটি হত্যাকাণ্ড হয়েছে, নিহত ব্যক্তি মুসলমানও না, এতে জাতির লজ্জার কী আছে? আলতাফ চৌধুরীর [যিনি সংসদে অবলীলায় সত্য নয় এমন কথা বলেন] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিত্বে জাতির লজ্জা হয় না, এথনিং-পলিটিক্যাল ক্লিনসিংয়ে জাতির লজ্জা হয় না, নিজামী পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় জাতির লজ্জা হয় না, একটা সামান্য ফরেনও নয়, দেশি মুরগির চুরিতে জাতি লজ্জিত হবে কেনো?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৮.১১.২০০১

www.pathagar.com

আছেন তো আপনারা সবাই শান্তিতে?

গাব খান সেতু উদ্বোধন করেছেন বেগম জিয়া। সেখানে তিনি এক নীতিনির্ধারণী ভাষণ দিয়েছেন। সে ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। একই দিনে আবার খবরের কাগজে (আগে ও পরেও) কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দুটি মিলিয়ে দেখুন এবং নিজের উপসংহার নিজেই ঠিক করুন।

১. বেগম জিয়া বলেন, 'কেউ সন্ত্রাস করলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে।' (*জনকণ্ঠ*, ২৩.১২.২০০১) অন্যদিকে দৈনিক *সংবাদ* জানাচ্ছে, 'সন্ত্রাস আরো জেঁকে বসেছে। নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, গফরগাঁও, বরিশালে শান্তি আসেনি। সন্ত্রাসকবলিত নতুন এলাকা নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও নেত্রকোনা।' (২১.১২.২০০১) শুধু তাই নয়, 'মীরসরাইয়ে দুস্থদের চাল লুটের সময় বাধা দেয়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হয়েছে এক মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪ জন। ফটিকছড়িতে চাঁদার জন্য সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে আহত করেছে এক ব্যবসায়ীকে। বাঁশখালীতে সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছে ৮ জন। গলাচিপায় উপকূলীয় চরাঞ্চলের কমপক্ষে দশ হাজার ভূমিহীন পরিবার ঈদ করতে পারেনি। ভৈরবে ৩শ' বাড়িতে হামলা-লুট।' (*জনকণ্ঠ*, ২১.১২.২০০১) এগুলো একদিনের কয়েকটি খবর। মহামান্য পুলিশরা কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চমৎকার একটি কথা বলেছেন, 'সন্ত্রাস দমনে আমাদের সবাইকে দলমতের ঊর্ধ্বে থাকবে হবে।' (ঐ) তার দুদিন আগে শিবচরের গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজার, ফেরিঘাট, খেয়াঘাট, নৌকাঘাট, গরুর হাট, বাসস্ট্যান্ডগুলো বিএনপির সন্ত্রাসীরা অনেক আগেই দখল করে নিয়েছে। এছাড়া সন্ত্রাসীদের ধার্যকৃত চাঁদার পরিমাণ ১ হাজার থেকে এক লাখ পর্যন্ত উঠে গেছে। (ঐ) শুধু তা-ই নয়, 'মহেশখালীর কেবল একটি ইউনিয়নের সহস্রাধিক বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী, এমনকি তিন সাংবাদিক দ্বীপে এবারের ঈদ জামাতে শরিক হতে পারেনি।' এমনকি *প্রথম আলো*ও জানাচ্ছে, 'আসলাম হত্যা : ফরাশগঞ্জবাসী স্তব্ধ, কাঁদছে শুধু বাবা-মা, আসামি নেতাকর্মীর রিমান্ডও নেয়নি পুলিশ।' (২১.১২.২০০১) শুধু তা-ই নয়, 'কক্সবাজার সৈকতে অবৈধ দখল শীর্ষে পুলিশ' (ঐ)

উল্লেখ্য, পুলিশ প্রশাসনের দুই চৌধুরী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আলতাফ চৌধুরী ও আইজি জনাব মোদাব্বির চৌধুরী এসবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। আরো উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে দেড় কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার পাকি আসামিকে রিমান্ডে নিতে চাইলে আদালত সম্মতি দেয়নি। ফরাশগঞ্জের খুনের আসামিদের পুলিশ নিজেই রিমান্ডে নিতে চায়নি। শাহরিয়ার কবিরকে পুলিশ দুইবার রিমান্ডে নিতে চেয়েছে এবং দুবারই আদালত তাতে রাজি হয়েছে। এ কারণেই কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন : 'দেখছি ব্যথিত মানবতা যাচ্ছে হেঁটে, পায়ে/যার/লোহার শেকল আর হাতে হ্যান্ডকাফ?'

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওই ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন, 'আমার দলের লোকেরা সন্ত্রাস করলে তাদেরও রেহাই দেয়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কিন্তু সংবাদপত্র জানাচ্ছে : 'ঢাকায় অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার নিয়ন্ত্রক সরকারদলীয় এক সাংসদ।' (*সংবাদ*, ২৫.১২.২০০১) আড়াইহাজারে একটি গ্রাম যখন '৭১-

www.pathagar.com

এর হানাদার বাহিনীর মতো বিএনপি-জামায়াত সন্ত্রাসীরা শেষ করে দেয়, তখন স্থানীয় এমপি আতাউর রহমান খান আঙ্গুর আধা কিলোমিটার দূরে এক স্কুলে চক্ষুশিবির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং হামলার খবর পাবার পরও তিনি ঘটনাস্থলে যাননি। এছাড়া তার বড় ভাই বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতা বদিউজ্জামান খসরু এ সময় থানায় অবস্থান করে প্রভাব খাটান বলে হামলার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।' (*জনকণ্ঠ*, ২৩.১২.২০০১) একই দিন 'বিএনপি ক্লাবে যুবক হত্যা' ও 'নারায়ণগঞ্জে পুলিশের হাত থেকে যুবদল নেতাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বিএনপি কর্মীরা' (*সংবাদ*, ২৩.১২.২০০১) এর আগে জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই দল নির্বিশেষে এমপিরা সংসদে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলেও দেশে এখনো সন্ত্রাস চলছে। সরকারি দলের এমপি বলেছেন, কুষ্টিয়া শহরে মাইক্রোবাস বোঝাই অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই।' (*ভোরের কাগজ*, ২৩.১২.২০০১) অবশ্য এসব আঁচ করেই সংসদে সদস্য পিন্টু বলেছেন, 'সংবাদপত্রে লেখালেখির জন্যই সন্ত্রাস হচ্ছে।' (ঐ) আশা করি সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকরা এর উত্তর দেবেন।

৪. বেগম খালেদা জিয়া একটি 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে' উপনীত হয়েছেন- 'গত পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ সম্পদ লুট, সন্ত্রাস করে দেশকে ধ্বংস করেছে। চারদলীয় জোটের নেতৃত্বাধীন সরকার দেশ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দূর করবে।' এটি পরের কথা, ক্ষমতায় তিনি আসীন হওয়ার একমাস পরই এ প্রসঙ্গে পত্রিকার মন্তব্য : 'দেশের মানুষ সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে একটা পরিবর্তন চেয়েছিলো; কিন্তু বাস্তবে তারা একটি উল্টো চিত্র দেখতে পাচ্ছে। সরকার ৫০ দিনের শামসামলে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি।' (*ভোরের কাগজ*, ২৭-১১.২০০১) ঈদের ছুটির চারদিনে 'বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আহত ১৫৬।' (*প্রথম আলো*, ২০-১২.২০০১) আওয়ামী শাসনামলে প্রথম ৯০ দিনে এমনটি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। জোট ৯০ দিনে যা করেছে, বাকি ১৭৭৫ দিনে দেশ আর মানুষ কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। বেগম জিয়া অবশ্য এতে না দমে বলেছেন :

৫. 'আমরা চাই দেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে।'

আছেন তো আপনারা সবাই শান্তিতে?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭.১২.২০০১

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পুলিশ : পরিণতি কি?

পুলিশের নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়ার শ্যালক সংখ্যা যে এতো, তা জানা ছিলো না। শুধু তা-ই নয়, তারা সবাই বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। এহেন লোক বাংলাদেশের মতো জায়গায় এখনো নিরাপদে চাকরি করছেন দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। আসলে ১০ তারিখের পত্রিকায় খবর পড়েছিলাম। ৯ তারিখ ছিলো আওয়ামী লীগের হরতাল। বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে রাস্তায় বসে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ (এমপিসহ)। আর কোহিনুর মিয়া বলছে, 'মার শালাদের।' আমরাও অনেক সময় ঠাট্টা করে শ্যালকদের বলি, 'মার শালাকে, ধর শালাকে।' কিন্তু তারপর মিয়া সাহেব যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন, তাতে কোনো কুটুম্ব প্রাণ থাকতে তার ঘরে আসবে না। মিয়া সাহেব হুকুম দিচ্ছেন- 'চোখ তুইল্লা ফেল।'

আমি বিষয়টি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে অনেক পাঠকের কাছে বিষয়টি রহস্যময় মনে হতে পারে। আমি এমন পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি যার মালিকদ্বয় হাসিনা-বিরোধী, যাতে পাঠক বলতে না পারেন বিএনপি-জামায়াতের মুখপত্র *ইনকিলাব* বা *যায়যায়দিন* অথবা হাসিনার সমর্থক বলে পরিচিত *ভোরের কাগজ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'ভুল' চিত্র তুলে ধরছি। দৈনিক *ইত্তেফাকের* রিপোর্ট অনুযায়ী মতিয়া ও নাসিমের নেতৃত্বে একটি মিছিল আওয়ামী অফিস থেকে বের হয় এবং তখন কোহিনুর মিয়া পুলিশকে বলেন, 'শালাদের ধর। মিছিলকারীরা পুলিশের বাধার মুখে সেখানে রাস্তার ওপর বসে পড়েন। এডিসি কোহিনুর মিয়া পুলিশদের কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। পুলিশ মিছিলকারীদের চারদিকে ৭/৮টি কাঁদানো গ্যাস ছুড়ে মারলেও তার একটি থেকেও গ্যাস বের হয়নি। ক্ষিপ্ত হয়ে এডিসি ২টি বিআরটিসি বাস রাস্তায় অবস্থানকারী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর দিয়ে চালিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।... [এরপর হুকুম দেন] শালারদের পিটাও। ...পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি বুট জুতা দিয়ে লাথি মেরে কর্মীদের মাটিতে ফেলে প্রহার শুরু করে। এক পর্যায়ে মোহাম্মদ নাসিমসহ মতিয়া চৌধুরীকে রাস্তায় ফেলে পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। মাটিতে ফেলে দিয়ে বুট দিয়ে নেতাদের লাথি মারতে দেখা যায়।... কোহিনূর মিয়া 'শালার চোখ তুলে ফেল' বলে পুলিশদের নির্দেশ দেন।... কয়েকজন মহিলা নেতা-কর্মীর কাপড় ধরেও পুলিশ টানাটানি করে।' (১০.১.০২)

এবার সে ছবিটি কল্পনায় আনুন। মতিয়া চৌধুরী ও নাসিম রাস্তায় লুটিয়ে আর হাসিমুখে আমাদের পয়সায় বেতন পাওয়া, আমাদের পয়সায় চুরি করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা পুলিশরা হাসিমুখে জনপ্রতিনিধিদের পেটাচ্ছে। কোহিনুরের জন্মের আগে থেকে মতিয়া চৌধুরী এদেশে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়, হয়তো মিয়ার মায়ের থেকেও বেশি বয়সী। মোহাম্মদ নাসিম বা আহসানউল্লাহ মাস্টারের কথা না-ই বা বললাম। রুচিবিকারগ্রস্ত ছাড়া সারা দেশের মানুষ এই সংবাদ পড়ে ও ছবি দেখে বিচলিত হয়েছে। এমনকি মাননীয় বিচারপতি এম. এ. আজিজও দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেন- 'মতিয়া চৌধুরীর মতো একজন মহিলাকে রাজপথে পুলিশ যেভাবে হেনস্থা করেছে তা সভ্য সমাজে চলতে পারে না।... মন্ত্রী না হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গেই বা পুলিশ কি এমন আচরণ করে? এতোটা ঔদ্ধত্য তারা পায় কোথায়? পুলিশ

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়েছে। তারা সবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।' (*প্রথম আলো*, ১৩.১.২০০২) শাহরিয়ার কবিরের মামলার শুনানির সময়ও বিচারক পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। যেমন আসামিকে পুলিশ স্পর্শ করতে পারবে না। আসামির জিজ্ঞাসাবাদের সময় কৌসুলিকে উপস্থিত থাকতে দিতে হবে। বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার অধিকার আছে। এসব বিষয়েই আইন আছে। কিন্তু পুলিশ মানছে কই? সবার কণ্ঠেই হতাশার সুর। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বললেও বোঝানো যাবে না পুলিশরা কি? এরা আর মানুষ নেই। পুলিশ আর মানুষে এখন পার্থক্য আছে।

আমরা চেয়েছি পুলিশ মানুষ থাকুক। কিন্তু মানুষ যখন পুলিশ হয় তখন যেনো সে আর মানুষ থাকে না (এ মন্তব্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ নেবেন না, পুলিশের যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে, এখানে সাধারণ ট্রেন্ডের কথাই বলা হচ্ছে)। যেদিন থেকে ইংরেজরা পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি করেছে, সেদিন থেকেই পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। ইংরেজরা নিজেদের পুলিশদের সৃষ্টি করেছে সেবাদানকারী হিসেবে আর কলোনির পুলিশের নিপীড়নকারী হিসেবে। ১৯৪৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ের বেশকিছু আলোকচিত্র সঙ্কলন পাওয়া যাবে দোকানে। সঙ্কলনগুলো দেখলে দেখবেন একটি বিষয়ে তাদের মিল আছে এবং তাই বর্তমান পুলিশের মৌল বৈশিষ্ট্য। সেটি হচ্ছে, রাস্তায় খালি মিছিল মানুষের মিছিল। অন্যদিকে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সশস্ত্র পুলিশ। মহিলাদের কাপড় খুলে ফেলছে। ছাত্রীর চুল ধরে পেটাচ্ছে পুলিশ। কিশোরকে বুটের তলায় মথিত করছে পুলিশ। গত পঞ্চাশ বছরে এর পরিবর্তন হয়নি।

মোহাম্মদ নাসিম অভিযোগ করে বলেছেন, এই কোহিনুরই ১৯৯৬ সালে জগন্নাথ হলে তাণ্ডব চালিয়েছিলো। (ভোরের কাগজ, ১০.১.২০০২)

সেই বিবরণটিও পড়া উচিত :

'আক্রমণ পরিচালনার সময় কয়েকজন ছাত্র হলের ক্যান্টিনে ভাত খাচ্ছিলো। পুলিশ ওখানে প্রবেশ করে লাথি মেরে সবার ভাত ফেলে দেয় এবং চিৎকার বলে বলতে থাকে, 'ওই মালাউনের বাচ্চারা, এবার বল দেখি জয় বাংলা।' (*আজকের কাগজ*, ১.২.১৯৯৬)

'পুলিশ অশ্লীল ভাষায় গালাগালির সঙ্গে ছাত্রদের মাথায়, পেটে ও বুকে লাথি ও রাইফেলের বাঁটের আঘাত করিতে থাকে। ...পুলিশ ছাত্রলীগের কর্মীদের... জয় বাংলা কও। তোমার... মধ্যে জয় বাংলা ঢুকামু ইত্যাদি অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া মারধর করে।' (*ইত্তেফাক*, ১.২.১৯৯৬) এই কোহিনুর মিয়া তখন থেকে এখন পর্যন্ত পুলিশের চাকরি করছে। কোনো শাস্তি হয়নি। কোনো দলের মন্ত্রী তার টিকিটি ছোননি। 'কোহিনুর মিয়া পুলিশে থাকলে যে কোনো সময় যে কাউকে সে হত্যা করতে পারে, সুতরাং তাকে আটকে রাখা হোক'- এ মর্মে কোন মানবাধিকার গোষ্ঠী বা কর্মীও হাইকোর্টে রিট করেনি। সে কারণে এখনো সে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। কেননা তার কোনো জবাবদিহিতা নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি মন্তব্য করা যায়, রাজনীতিবিদদের ভেতরও মানুষের কল্যাণ করার থেকে নিপীড়ন বা প্রতিশোধ নেয়ার বোধ কাজ করে বেশি। না হলে পুলিশের চরিত্র এমন হবে কেনো?

এসব দেখে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের পয়সায় চলা আমাদের ওপর অত্যাচার করার জন্যই কি আমাদের পয়সায় চলা পুলিশ বাহিনীকে রাখবো? তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে রেশন, বিনা পয়সায় পোশাক-আশাক, দেয়া হয় অনেক সুযোগ-সুবিধা। (চুরির কথা বাদই দিলাম)

www.pathagar.com

এতোসব পেয়েও যারা প্রতিপালকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মানুষ বলি কি করে? আপনি থানায় অভিযোগ নিয়ে যান, আপনাকেই সন্দেহভাজন মনে করা হবে। অত্যাচার করা হবে। অন্যদিকে প্রায় ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসীকে তারা ধরতে পারে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুনের সুরাহা করতে পারে না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে তার অবনতি ঘটায়। ইউনিফর্ম চড়ানো মাত্র প্রতিটি পুলিশ বাংলাদেশকে তার পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে। পুলিশ সব সময় সবলের পক্ষে অর্থশালী ও ক্ষমতাশালীর পক্ষে। 'পুলিশ ছুলে আঠারো ঘা'- এ ধরনের অসম্ভব প্রবাদ বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও নেই। আর প্রবাদের ভিত্তি তো অভিজ্ঞতা।

অনেকে বলেন, পুলিশকে কেনো দোষ দেন? রাজনীতিবিদদের কথাতেই তারা চলেন। কথাটির যুক্তি নেই তা নয়। এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গির কথা। গত ত্রিশ বছর দেখা যাচ্ছে, যে দল ক্ষমতায় থাকে, তারাই বিরোধীদের ধর্মঘট, হরতাল, মিছিলে বাধা দেয় এবং সুযোগ পেলেই পুলিশ দিয়ে পেটায়। প্রতিটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। এই একটি ব্যাপারে মাত্র পুলিশ নিরপেক্ষ। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা নন, সিনিয়র রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রীরাও নিয়মিত নিগৃহীত হচ্ছেন কোহিনুর মিয়াদের দ্বারা। মতিন চৌধুরী প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর পুলিশ দ্বারা প্রহৃত হলে নাকি বলেছিলেন, আমার পুলিশ আমাকেই মারলো। এর আগে তার পুলিশ পেটাতে পেটাতে ড্রেনে ফেলে দিয়েছিলো মোহাম্মদ নাসিম ও জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদককে। মোহাম্মদ নাসিমের পুলিশও সাদেক হোসেন খোকাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলো এবং অনেক নেতা এই মন্তব্য করেছিলেন, খোকা গরুর রক্ত মেখে এসেছেন। অনেকে এতে নির্মল আনন্দ পেয়েছেন কিন্তু পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম, গত ১৫ বছর আমরাই বারবার এর নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছি। মূল কথা হলো, একজন জনপ্রতিনিধি (রাজনীতিবিদ) যিনি জাতীয় ব্যক্তিত্ব (মন্ত্রীও হতে পারেন), তার ওপর পুলিশের সবচেয়ে নিম্নপদস্থ ব্যক্তিটি কেনো লাঠি ওঠাবে? একজন এমপি বা রাজনীতিবিদদের গায়ে হাত তোলা মানে সিভিল কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা এবং এগুলো শুধু সামরিক আমলেই নয়, গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও ঘটেছে। পুলিশ সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে, যা রাজনৈতিক দল বা গণতন্ত্রের জন্য শুভ সংবাদ নয়। ক্ষমতাবানরা কি এটি বোঝেন? এটি সংস্কৃতির বিষয়। এখন যা হচ্ছে তা জংলী সংস্কৃতি যা সভা সমাজে প্রযোজ্য নয়। আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত এসব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী রাজনীতিবিদ এবং কলঙ্কজনক পুলিশ প্রতিষ্ঠানের জন্য।

দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য। কোহিনুর মিয়াকে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেশ দিয়েছিলেন মতিয়া চৌধুরীকে পেটাতে? এর উত্তর জানা উচিত। যদি তিনি না দিয়ে থাকেন তবে কোহিনুর মিয়াদের কেনো শাস্তি দেয়া হবে না? একজন নিম্নপদস্থ ব্যক্তি যখন জাতীয় কোনো ব্যক্তিত্বের গায়ে হাত তোলে তখনই চেইন অব কমান্ড ভেঙে যায়। সেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (হোক না প্রাক্তন) বা মতিয়া চৌধুরীদের পেটাতে পারলে ওপরের অফিসারকে পেটানো (কথা না শোনা) যাবে না কেনো? বিচারপতি যে বলেছেন, পুলিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, এটি তার একটি কারণ। আর কোহিনুর মিয়াদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সৎ ও বিবেকবান পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা বিপদে পড়বেন।

আরো আছে। ৯ তারিখ কি ধর্মঘট, মিছিল এগুলো নিষিদ্ধ ছিলো? না। তাহলে পুলিশ যে এ বেআইনি কাজগুলো করলো তার বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়া যায় না? মাহফুজ আনাম *ডেইলি*

www.pathagar.com

স্টারে লিখেছেন, মাটিতে হামাগুড়ি দেয়া মতিয়া চৌধুরী আর তাকে মারতে উদ্যত পুলিশ-এ ছবিটি লোকের মন থেকে মোছে না, মানুষ তা ভুলবে না। বিচারকও ভোলেননি। আমার সঙ্গে যতোজনের কথা হয়েছে, ততোজনেই এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য আমাদের দুঃখে কখনো ক্ষমতাসীনদের হৃদয় গলেনি, এখনো গলবে না। তবে এর প্রতিকার যারা করেননি, তাদের সরে যেতে হয়েছে। যারা করবে না, তাদেরও চলে যেতে হবে। প্রত্যেকটি দলের অপদস্থ হয়ে ক্ষমতা ত্যাগের একটি কারণ পুলিশ।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমতে জমতে আজ তা পাহাড়প্রমাণ। যে কোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে যেখানে পুলিশ হিন্দুদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, বিরোধী দলীয় কর্মীদের ওপর নির্যাতন রুখছে না এবং মামলাও নিচ্ছে না। টাকার লেনদেনের কথা না-ই বা বললাম। এসবের ফলাফল অত্যন্ত অশুভ, যার দুটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে :

১. বিএনপি-বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির বদলে বাংলাদেশ নাজি পার্টি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবে এবং এই ক্ষমতার ভিত শিথিল করে দেবে। কারণ এ ধরনের নিপীড়ন দেশে প্রতিশোধমূলক স্পৃহার সৃষ্টি করবে যা সূচনা করতে পারে গৃহযুদ্ধের।

২. এই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি গণপিটুনিতে যার সংখ্যা বাড়ছে। ক্ষমতাসীনরা বলছেন, এগুলো সচেতনতার পরিচয়। তো মানুষ আরেকটু সচেতন হলে পুলিশের কি হবে? তাদের আত্মীয়স্বজনরা তো আমাদের মধ্যেই বসবাস করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে তোলা কয়েকটি ছবি মনে পড়ছে। ঢাল-তলোয়ার ফেলে পুলিশ দৌড়াচ্ছে, পিছনে মানুষ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২.০১.২০০২

www.pathagar.com

ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে

ঢাকা বা চট্টগ্রামে সকালে পত্রিকা পড়ে খানিকটা ক্ষুব্ধ, খানিকটা হতাশ হতে পারেন বা বিএনপি-জামায়াত সমর্থক হলে বলতে পারেন *ইনকিলাব* ছাড়া সব পত্রিকাই তো দেখছি আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে গেলো। সব বিষয়ে তারা খানিকটা অতিরঞ্জন করবেই। তারপর, পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে রওনা হতে পারেন কর্মস্থলে। কিন্তু মেট্রোপলিটন সীমার বাইরে সৃষ্টি হয়েছে অন্য এক বাংলাদেশের, যে বাংলাদেশের সঙ্গে হে মেট্রোপলিটনবাসী আপনাদের কোনো পরিচয় নেই। সে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে। সেখানে প্রশাসনের কোনো কর্তৃত্ব নেই বা প্রশাসন ও বিএনপি-জামায়াতকে আলাদাভাবে দেখার উপায় নেই, প্রশাসন যেনো তাদের অঙ্গসংগঠন আর পুলিশ হচ্ছে ক্যাডার বাহিনী। সে বাংলাদেশ কেমন তা পত্রিকা পড়ে বোঝা সম্ভব নয়।

মেট্রোপলিটনের বাইরে যদি আপনি যান, তাহলে আপাতদৃষ্টিতে আপনার মনে হবে না তেমন কিছু ঘটছে। ক্ষেতে কৃষক কাজ করছে, হাটবাজার বসছে। কিন্তু কারো মুখে হাসি নেই, কারণ কেউ জানে না কখন কী ঘটবে? একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে না কারো কাছে তাহলো, কেনো বিএনপি দেশটিকে ধর্ষক, খুনি, লুটেরাদের দেশে পরিণত করতে চাচ্ছে? জামায়াত চাইতে পারে। তারা বাংলাদেশ চায়নি, এখনো চায় না। তারা চায় দেশটি আঁস্তাকুড়ে পরিণত হোক। মানুষ জী জী করুক। তাতে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা তৃপ্ত হবে। অনেকে বলতে পারেন, বিএনপি কি এখন আর স্বতন্ত্র কোনো দল? জামায়াতের সঙ্গে তো তাদের আলাদা করাই মুশকিল। বরং দুই দলের মধুর মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক দলের, যার নাম দেয়া যেতে পারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী জামায়াত দল বা সংক্ষেপে ইংরেজিতে বিএনজেপি। হয়তো বলতে পারেন জেনারেল জিয়া পাকিকরণের যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশ মূল্যবোধ বিনষ্ট করে, এখন তা-ই পরিণতি লাভ করছে। হয়তো বা।

বাংলাদেশকে বর্তমানে দুঃস্বপ্নের একটি দেশে পরিণত করার জন্য 'বিএনজেপি' কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। সোনার বাংলা এ দেশ কখনো ছিলো না; কিন্তু স্বপ্ন দেখানো হয়েছিলো সোনার বাংলার। সেই স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু সোনার বাংলার স্বপ্ন- স্বপ্নই থেকে গেলো। ১৯৭২ সালের পর আওয়ামী লীগ কর্মীদের, তারপর সাফারি পরা যুবকদের, এরপর টিনপট ডিকটেটরের জাতীয় বাহিনীর কাছে পদদলিত হয়েছে স্বপ্ন। এরা যে যখন ক্ষমতায় থেকেছে, তখনই দেশটিকে ভেবেছে পৈতৃক সম্পত্তি।

১৯৯০-২০০১- এ সময় বিএনপি ও আওয়ামী লীগারদের বেশি-কম দাপট আমরা দেখেছি। দেশকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাবার প্রবণতায় তখন খানিকটা ভাটা পড়েছিলো। এর কারণ, বৃদ্ধি পাচ্ছিলো মানুষের ক্রোধ, সচেতনতা। মানুষ আর ঠিক আগের মতো নেই। দেখলে মনে হয় বশংবদ, কিন্তু কখন আবার জ্বলে ওঠে কে জানে!

বিএনজেপি ক্ষমতায় আসার পর সেই পুরনো ভাব আবার ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, নিলামে তারা দেশটিকে কিনে নিয়েছে। লতিফুর-সাঈদ-মুয়ীদরা তাদের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে সাহায্য করেছেন সংসদে, তাতেই এ ভাবটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএনজেপি কর্তৃত্বে বলিয়ান হয়ে গত পাঁচ মাসে এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যার নাম দেয়া যায় জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতি। অর্থাৎ যা করতে ইচ্ছে হবে তা-ই করবে ঝটাঝট। অগ্র-

www.pathagar.com

পশ্চাৎ বিবেচনা বা দেশ-মানুষের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই। এই সংস্কৃতির মূল হচ্ছে ভায়োলেন্স। সেই ভায়োলেন্স যতো তীব্র হবে ততো উত্তম। এর উদ্দেশ্য, মানুষকে দমিত রাখা এবং সাধারণের মধ্যে এক ধরনের হতাশা-বিষাদের সৃষ্টি করা। বিষাদিত জীবনের অপর নাম মৃত্যু।

জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতির উদাহরণগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন আপনারা দেখছেন। নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই। কয়েকদিন আগে আন্ধারমানিক নদী পেরুচ্ছি এক ফেরিতে, কথাচ্ছলে একজন বললেন, চাঁদা দিতে হবে, না দিলে খুন; মেয়ে দিতে হবে, মেয়ে না থাকলে তরুণী স্ত্রী তো আছে, আর যদি মেয়ে না থাকে ব্লাডমানি হিসেবে টাকা দিতে হবে। বিএনজেপির রাজত্বে থাকলে এক ধরনের দাসত্ব বা জিজিরায় কর দিতে হবে। এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হিন্দু, আওয়ামী লীগ বা বিরোধীদের বেলায়। গত এক সপ্তাহের চিত্র আগের এক সপ্তাহ থেকে খারাপ। ঈদের ছুটিতে সারা দেশে খুন হয়েছে ৪৮ জন, এক ঢাকাতেই ২২ জন। আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের উৎসাহ নেই। (*প্রথম আলো*) কারণ তারা নিজেদের এখন ভাবে বিএনজেপির অঙ্গসংগঠন হিসেবে। 'পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী গত ১ ফেব্রুয়ারি হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা মহানগর এলাকায় খুন হয়েছেন ৪৬ জন।' (*বাংলাবাজার পত্রিকা*, ২.৩.২০০২) সন্ত্রাসীদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, পুলিশ বরং সে প্রচেষ্টায়ই ব্যস্ত। রূপসা-তেরখাদা উপজেলায় কয়েকদিন আগে যে ভয়াবহ তাণ্ডব হলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, 'বাধাল গ্রামের একমাস বয়সী শিশুও পুলিশের নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বাধাল গ্রামবাসীদের মতে, পুলিশ দুর্জনীমহল এবং মোকামপুরের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে তাদের ওপর অত্যাচার করেছে। দুর্জনীমহলবাদীদের অভিযোগ, পুলিশ বাধালের সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে তাদের আক্রমণ করেছে।' (*জনকণ্ঠ*, ২.৩.২০০২)

বিএনজেপির কর্মীরা নির্বাচনের পরপর পূর্ণিমার মতো কয়েকশ' মহিলা (কিশোরী)-কে ধর্ষণ করেছে। কোনো বিচার হয়নি। কয়েকদিন আগে আওয়ামী সমর্থকের মেয়ে মহিমাকে ধর্ষণ করেছে, গণধর্ষণ। আপনাদের কারো কি পূর্ণিমা বা মহিমার বয়সী মেয়ে আছে? ধানের শীষে পুলক করে যারা ভোট দিয়েছেন, তাদের জিজ্ঞেস করছি। মহিমা বা পূর্ণিমার জায়গায় আপনার মেয়েটিকে ভাবুন, দেখুন তো কেমন লাগে। আরেকটি ঘটনার কথা কি মনে আছে? আরেক কিশোরীর মা হাত জোড় করে বিএনজেপির গণধর্ষকদের মিনতি করে বলছে— বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট। আপনারা একজন একজন করে আসেন। ভাবছেন, ধানের শীষে ভোট দিয়েছেন, আপনাদের এমন মিনতি করতে হবে না? পূর্ণিমার মাও ধানের শীষে ভোট দিয়েছিলো।

প্রাক্তন বায়ুসেনা আলতাফ চৌধুরীও গেছেন মহিমার বাসায় এবং কেঁদেছেন। আলতাফ চৌধুরীর কান্না যদি আন্তরিক হতো, তাহলে তিনি বলতেন না, আওয়ামী লীগ আমলেও ধর্ষণ হয়েছে তার বিচার হয়নি দেখেই আবার ধর্ষণ হয়েছে। এটা রাজনৈতিক প্রতিশোধ নয়, সন্ত্রাসী ঘটনা। তার মানে কি সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের অধিকার রাখে। নিশ্চিত থাকুন, আলতাফ চৌধুরীরা যতোদিন আছেন, ততোদিন কেউ কোনো বিচার পাবেন না। যেমন পায়নি পূর্ণিমা, সীমা, ইন্দ্রানী। পূর্ণিমা সাহসী কিন্তু অন্যরা আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। কারণ এদেশে ধর্ষিত হয়ে বেঁচে থাকা আরো যন্ত্রণার। কারণ ধর্ষকরা তো সামনেই ঘুরছে। 'বিএনপি নেতার সহায়তায় মহিমা ধর্ষক ছাত্রদল ক্যাডাররা ভারতে পালিয়েছে।' (*জনকণ্ঠ*, ঐ) আরো আছে,

www.pathagar.com

'মহিমার পরিবারকে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে- আওয়ামী লীগ কর্মী বলে পরিচয় দিলে কোনো লাভ নেই। সরকার বিএনপি-জামায়াতের। আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ করলে মেয়ের বিচার তো পাবেনই না; উপরন্তু আপনাদের ক্ষতি হবে বলে কর্মকর্তাদ্বয় মহিমার বাবাকে শাসান বলে সূত্রটি জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও বিএনপি সমর্থকরা যৌথভাবে মহিমাদের বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে।' (*সংবাদ*, ২.৩.২০০২) শুধু তা-ই নয়, গতকাল খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রেপ্তারের দশ ঘণ্টার মধ্যে নারী নির্যাতনকারীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (*ঐ*)

সুতরাং আইন আবার কী? আমরা কি দেখিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বৈঠক করছেন টপটেররদের সঙ্গে। পুলিশের বাবার সাধ্য আছে সেইসব টেররের গায়ে হাত দেয়ার? বিএনপির মতে, এরা দলের ত্যাগী কর্মী। বুঝুন একবার। মাত্র একদিনের, হ্যাঁ একদিনের পত্রিকা থেকে ঝটাঝট সংস্কৃতির কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. বিএনপি ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা গত বৃহস্পতিবার রাতে নাটোরের লালপুর উপজেলার আওয়ামী লীগ সমর্থক একটি বাড়িতে ঢুকে প্রতিপক্ষকে না পেয়ে তার স্ত্রীর মাথায় গুলি করে এবং ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে কুপিয়ে জখম করে ফিরে আসার সময় বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক ভাগ্নেকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছে।

২. বাগেরহাটে যুবলীগ কর্মীর চোখ উপড়ে রগ কেটে নিয়েছে যুবদলের দুই ভাই।

৩. মুন্সীগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মীর দুই পায়ের রগ কর্তন।

৪. চিফ হুইপের পুত্রের বাহিনীর চাঁদাবাজি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত এবং ঘিওর-শিবালয় এলাকায় 'সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়'। এসব খবর কোনো হাসিনা কণ্ঠের নয়, দৈনিক *প্রথম আলোর*।

বিএনপির প্রথম একশ' দিনে সারা দেশে খুন হয়েছে ৯২৯ জন, ধর্ষিত হয়েছে ২৬৯ জন, অ্যাসিড নিক্ষেপের শিক্ষার ৩০০০, হিন্দুর বাড়িঘর ধ্বংস ৪০০০ ও ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিত হিন্দুর সংখ্যা ৫০০০। বিরোধী দলের নির্যাতিতদের খবর এখানে নেই। (*ইত্তেফাক*, ২৬.১.২০০২) উল্লেখ্য, ইত্তেফাকের দুইজন মালিকই আওয়ামী লীগ বিরোধী।

এ সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এর কারণ অনেক। তবে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। লতিফুর-সাঈদ-মুয়ীদ গং যখন বিএনপি-জামায়াতকে ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন তাতে বেজায় সায় ছিলো আমেরিকার, পশ্চিমের কিছু দেশ ও ভারতের। বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উপদেশ তখন প্রায়-ই শুনতাম। কারণ এদের কাছে মানুষ বড় কিছু নয়, দেশের ভৌগোলিক সীমা ও সম্পর্কই মূল। বিএনজেপির দর্শনও তা-ই। দরিদ্র দেশের মানুষকে তারা বোঝা মনে করে। বাংলাদেশে যা ঘটছে তা কি সত্য? জানতে চেয়েছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের এক সদস্য। জবাবে ঢাকার বৃটিশ হাইকমিশন থেকে বিএনজেপির মতো জানানো হয়েছে, না তেমন কিছু ঘটছে না। কয়েকটি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হয়েছে তা ফলস। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করেছে বিএনজেপি নেতাকর্মীদের। এই দলের নেতারাও কর্মীদের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনাদের মনে আছে কি-না জানি না, গণপিটুনিতে যখন মানুষ হত্যা করা হয়েছে তখন প্রাক্তন বায়ুসেনা, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপি বলেছিলেন মৃদুহেসে, মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। অর্থাৎ হত্যা করার ক্ষেত্রে। গত ত্রিশ বছরে কোনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আইজিপি একথা বলেননি। এরই সূত্র ধরে ডাক প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লা বলেছেন, 'সন্ত্রাসীদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।' (*ইত্তেফাক*,

www.pathagar.com

২৭.২.২০০২) অর্থাৎ কে অপরাধী বা কী হবে তার শাস্তি তা নির্ধারণ করবে বিএনজেপির নেতারা।

পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন ১০ জন ধর্ষিত হচ্ছে ও নির্যাতিত হচ্ছে ৩৭ নারী ও শিশু। পুলিশের হিসাব সাধারণত রক্ষণশীল। আসল হিসাব এর দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে আদালত মামলার দুর্বলতার কারণে শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে দায়ের করা ৯৫ ভাগ মামলায় আসামির কোনো সাজা হচ্ছে না। এ বছর নারী নির্যাতন আইনে দায়ের করা মামলার সব আসামিই খালাস পেয়ে গেছে বলে সূত্র জানায়। (*জনকণ্ঠ*, ২.৩.২০০২)

এই হারে ধর্ষণ, নির্যাতন ও খুন বাড়তে থাকলে বিএনপি সমর্থকদের পরিবারও ধর্ষণ, নির্যাতন ও খুন থেকে রক্ষা পাবেন কি-না সন্দেহ। *বাংলাবাজার পত্রিকা* খবর দিয়েছে, 'নিজ দলের লোকজনও রেহাই পাচ্ছে না।' (২.৩.২০০২) কারণ ধর্ষক, খুনিদের প্রায় ক্ষেত্রে বিচার হয় না, তারা শাস্তি পায় না। জাতীয়তাবাদী ঝটাঝট সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার হচ্ছে। প্রতিটি ধর্ষণ, প্রতিটি খুন, প্রতিটি নির্যাতন দেশের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। মানবতাবাদী মার্কিন ও পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা কিন্তু এখন উপদেশ বা পরামর্শ দিচ্ছেন না। কেনো দিচ্ছেন না, তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি।

বিএনপি-জামায়াতে যে এতো ধর্ষক, এতো খুনি, এতো নির্যাতনকারী, এতো প্রতিশোধকামী মানুষ আছে জানা ছিলো না। দলটি তাহলে এদের দ্বারাই সৃষ্ট? এরা দেশটিকে পরিণত করছে ধর্ষক, খুনি ও লুটেরাদের দেশে। সারা বিশ্বে খালেদা-নিজামী সরকার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করছে। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীদের এখন দেখা হচ্ছে ও হবে খুনি, ধর্ষক ও লুটেরাদের দেশের নাগরিক হিসেবে। এ ভাবমূর্তি দেশে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেবে। কমনওয়েলথ চিন্তা করছে জিম্বাবুয়েকে বহিষ্কার করবে; কারণ, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, জিম্বাবুয়েতে যা চলছে তা 'ফান্ডামেন্টাল ভ্যালুজ অফ কমনওয়েলথ'। বাংলাদেশও সে পথে চলছে। এ দেশটিও বিএনজেপির কল্যাণে কমনওয়েলথ থেকে বহিস্কৃত হবে কি-না কে জানে।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যেটি ঘটছে, তাহলো সাধারণের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল হচ্ছে। মফস্বলের এক চায়ের দোকানে বসে আছি। শুনি একজন আরেকজনকে বলছে, 'শালারা ভাবছে কী, দিন আসুক, বাড়ি থাইক্কা তুইল্যা আনুম।' এটি যাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তারা হলো বিএনজেপির নেতাকর্মী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। অন্যজন একথা শুনে বললো, 'সবাই কি শহরে থাহে? তাগো আত্মীয়স্বজনরে পামু না?' কী ভয়ঙ্কর আলোচনা। জোট তো আজীবন ক্ষমতায় থাকবে না। তখন এই প্রতিশোধস্পৃহা কি থামানো যাবে? এখন যে নীরব গৃহযুদ্ধ চলছে তা প্রবল হবে। এবং আমরা অনেকেই তখন হত হবো, হত হবে বিএনজেপির নেতাকর্মীরা, তাদের পক্ষের অনেক মহিলাও তখন বলবে— বাবারা, একজন একজন করে আসো, আমার মেয়েটা ছোট। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ তখন এই গৃহযুদ্ধ থামাবার জন্য কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দেবে। এবং তখনই গ্যাস, তেল, পাইপ লাইন— সব নিশ্চিত হবে। বিএনপির সমর্থকদের বলি, এ অবস্থা হতে দেবেন না, সবাই বিদেশ যেতে পারবেন না। আলতাফ চৌধুরীদের বোঝান। জানি না, বিএনপি সমর্থকরা কী করবেন। তবে লক্ষ করেছেন কি রাস্তাঘাটে, অফিস-আদালতে বিএনপির ইউনিফরম, সেই সাফারি স্যুট পরা মানুষজন খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪.৩.২০০২

www.pathagar.com

সাঈদীয় নির্বাচন ও সমাজের সন্ত্রাসীকরণ

জনাব এম. এ. সাঈদের টুপিতে আরেকটি কালো পালক যুক্ত হলো পৌর বা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের মাধ্যমে। তিনি তার জজবার স্বাক্ষর রেখেছেন এই নির্বাচনে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত দু'ধরনের নির্বাচন ছিলো বিখ্যাত। একটি বিচারপতি এম. এ. রউফের মডেল- মাগুরা নির্বাচন। অন্যটি বিচারপতি সাদেকের সাদেকালি নির্বাচন। বিচারপতিদের নির্বাচনী মডেলে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে প্রাক্তন আমলা আবু হেনাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়। যেহেতু প্রাক্তন বিচারপতিদের মতো তিনি প্রবল ডানপন্থী ছিলেন না এবং কোন দলের অনুগ্রহ চাননি, সে জন্য বিএনপি তাকে বাধ্য করে সরে যেতে। একটি ধারণা জন্মেছিলো সবার মাঝে যে, প্রাক্তন বিচারপতিদের নৈরাশ্যজনক কর্মকাণ্ডের পর অন্তত আমলারা খানিকটা কর্মদক্ষতা দেখাবেন, অন্তত নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবেন। সে কারণে প্রাক্তন আমলা এম. এ. সাঈদের আবির্ভাব। তিনি সচিব ছিলেন, তারপর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের আনুকূল্যে বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশের কোটার চাকরি পান। এবিএম মূসা লিখেছেন, সে সময় নাকি তাকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো, যে অভিযোগ এখনো বহাল। সেই কর্মজীবন শেষে, রাষ্ট্রপতি আবার তাকে বেছে নেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে।

শোনা যায়, শেখ হাসিনারও তাতে সম্মতি ছিলো এ কারণে যে, এম. এ. সাঈদ নাকি গোপালগঞ্জের। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় কিছু মানুষজনের মধ্যে এক ধরনের মূর্খতা বিরাজ করে। তারা মনে করেন, গোপালগঞ্জের সবাই নিষ্কলঙ্ক এবং নেতারা সবাই একেকজন মিনি বঙ্গবন্ধু।

যাক, তার পরের ইতিহাস সবার জানা। এম. এ. সাঈদ, জনাব রউফ, জনাব সাদেকের মতো স্থান করে নিলেন রাজনৈতিক ইতিহাসে- সাঈদীয় নির্বাচনের জন্য। সাঈদীয় নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করতে হবে এবং ইংরেজি ভাষায় বলতে হবে 'নো ওয়ে'। এই 'নো ওয়ে' প্রযোজ্য হবে জামায়াত, বিএনপি, ইসলামি ঐক্যজোটের মতো চরম ডানপন্থী দলগুলোর বিরোধীদের প্রতি। এ নির্বাচনে সব সময় একটা 'ওয়ে' থাকবে বিএনপির প্রতি। সাঈদীয় প্যাটার্নের দ্বিতীয় ধাপ, হম্বিতম্বির পর বিভিন্ন জায়গায় জোটপছন্দ লোকদের বসানো। তৃতীয় ধাপ, সেনাবাহিনী মোতায়েন। এদের প্রথম কাজ হয় বিরোধীদের অর্থাৎ বিএনপি-জামায়াত বিরোধীদের ঠ্যাঙানো। জাতীয় ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সন্ত্রাস দমনে যদি সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়, তাহলে এতো সন্ত্রাসী 'নির্বাচিত' হয় কীভাবে? এগারো দলও এখন সাধারণ মানুষের পর্যবেক্ষণ মানতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের সভায় বলা হয়েছে, সেনাসদস্যরা রাজশাহীতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের হয়রানি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেনাবাহিনীকে দিয়ে ছিনতাইকৃত নির্বাচনী বিজয় জনগণকে মানতে ব্যাখ্যা করার জন্যই রাজশাহীতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়নি। (*জনকণ্ঠ*, ২৮.৪.২০০২) সাঈদীয় নির্বাচনে চতুর্থ ধাপ, এরশাদ আমলের মতো হঠাৎ করে ফলাফল ঘোষণায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। তারপর সব গোছগাছ করে ফলাফল ঘোষণা করা। ওইদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে। টেলিভিশনে দেখা যায় সস্ত্রীক জনাব সাঈদ ভোট দিচ্ছেন আর বলছেন, 'দুষ্টুরা নেই, দুষ্টুরা সব পালিয়েছে।' সন্ত্রাসীরা তো সব হয় সন্তান, না হয় প্রেমিক,

www.pathagar.com

'দুষ্ট' ছাড়া আর কী নামেই বা তাদের সম্বোধন করা যায়! মনে রাখা দরকার, নির্বাচনী ফলাফল মনিটরিং করার সময় প্রাক্তন বিএনপি আমলাদের থাকতে হয় নির্বাচনী কার্যালয়ে। সহায়তা করার জন্য কি?

এহেন জনাব সাঈদ যখন আবার সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আয়োজন করলেন, তখনই সবাই অনুধাবন করে নিয়েছিলো ফলাফল কী হবে। সাঈদ, মুয়ীদ, লতিফুর ঐক্যজোটের কল্যাণে জাতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত ও জামায়াত প্রভাবিত বিএনপি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে এবং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পলিটিক্যাল ও এথনিং ক্লিনসিং শুরু করেছে যা এখনো অব্যাহত। এর সর্বশেষ উদাহরণ কাপাসিয়ার জামাল ও ফটিকছড়ির জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির। সিটি করপোরেশনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি এ ধারণাই হলো, একইভাবে তিনটি সিটি, বিশেষ করে ঢাকাকে সম্পূর্ণ করায়ত্তে আনতে হবে সন্ত্রাসের মাধ্যমে।

ঢাকার মেয়র জনাব হানিফের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু একটি সিদ্ধান্তের জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, কোনো অবস্থায়ই সাঈদীয় নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন না। করলে একে বৈধতা দেয়া হতো, যেভাবে আওয়ামী লীগ বৈধতা প্রদান করেছে গত নির্বাচনকে। অথচ সবাই সাবধান করে দিয়েছিলো এই বলে যে, ফলাফল সব সাজানো। নির্বাচনে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রথম থেকেই সন্ত্রাসীরা ব্যাপকহারে দাঁড়ালো। যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হম্বিতম্বিতে জাতি অস্থির ছিলো, এবার যেনো সেই হম্বিতম্বি একটু কমে গেলো। তাদের দমনের জন্য কোনো আইনের সুপারিশও করলেন না মহামানব সিইসি। লাল্টুরা যখন মাঠে নেমে গেলো, তখনই বোঝা গেলো কী হবে।

এখানে বামপন্থী নেতা রাজশাহীতে মেয়র পদপ্রার্থী জনাব বাদশার কথা বলতে হয়। তারা এবং ১১ দল জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে রায় দিয়েছিলো যখন, সবাই জানতো তা অবাধেও নয়, সুষ্ঠুও নয়। হয়তো বাদশা ভেবেছিলেন, বিএনপি বিভক্ত, আওয়ামী লীগ তার সমর্থনে, তার জেতা ঠেকায় কে? মাঝে মাঝে বামপন্থীরা এতো সরল শিশুর মতো আচরণ করেন! আওয়ামী লীগারদের সেই গোপালগঞ্জের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের মতো আর কী! এখন রাশেদ খান মেনন বলছেন, 'বিএনপি-জামায়াত জোট দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনে উন্মত্ত আচরণ করেছে। রাজশাহীতে এগারো দলের বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।' (*জনকণ্ঠ*, ২৮.৪.২০০২) সত্যিই নাকি? সাঈদীয় নির্বাচনে প্রবলভাবে আস্থা রাখার পর এখন একথা বললে কে আর পাত্তা দেবে?

সাঈদীয় সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে কী হয়েছে তা সবার জানা। নিস্তব্ধ ঢাকায় নাকি ৩৪ ভাগ ভোট পড়েছে! 'এতো ভোট কারা দিলো?' রাজশাহীর সর্বত্র আলোচনা একটাই- ভোট দিলাম কাকে আর জয়ী হলো কে?' বা 'ভোটার উপস্থিতি ছিলো নজিরবিহীনভাবে কম।' বিএনপি বা কমিশন যা চেয়েছিলো তা-ই হয়েছে, শুধু ঢাকা সিটি করপোরেশনেই তালিকাভুক্ত ২১ জন সন্ত্রাসী জয়ী হয়েছে।

শুনলাম, সাদেক হোসেন খোকা নাকি টেলিভিশনে বলেছেন, এসব সন্ত্রাসীকে এখন জনসেবা করতে দিলে তারা ভালো হয়ে যাবে। লজিকটা চমৎকার না? এখন বোঝা যাচ্ছে, কেনো সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেয়নি কমিশন ও প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আসলে জনসেবার জন্যই বোধ হয় জেলের পর জেল খুলে সব বিএনপি

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীকে মুক্ত করা হয়েছে। জনাব খোকা, অন্যান্য দলের সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিলে কি তারা জনসেবা করতে পারবে না? নাকি খালি জোট সন্ত্রাসীরাই জনসেবা করতে পারেন? ঢাকার মানুষজন, এবার প্রস্তুত হোন সন্ত্রাসী সেবা গ্রহণে।

তবে সাঈদীয় নির্বাচনে একটি কাজ হয়েছে। ঢাকা, খুলনা বা রাজশাহীর এলিট মহল যে জাতীয় নির্বাচন 'সুষ্ঠু সুষ্ঠু' বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন, এখন তারা অনুধাবন করছেন যে আসলে এম. এ. সাঈদ অ্যান্ড গং কী করেছিলেন। তারাও নিশ্চুপ। এই এলিটরা দেশ-বিদেশে যান। একটু চক্ষুলজ্জা না থাকলে ভদ্রসমাজে তো আর কল্কে পাবেন না। সাধারণ মানুষ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো সরকারের বিরুদ্ধে, এবারো ভোট না দিয়ে তারা জানালো বাংলাদেশে এম. এ. সাঈদের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। হতে পারে না। তবে তাকে আশ্বস্ত করতে পারে এই বলে যে, বাংলাদেশে যদি কখনো 'প্রতিকৃতি জাদুঘর' হয়, তাহলে বিখ্যাত ভিলেনদের মধ্যে তার প্রতিকৃতিও থাকবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি অ্যান পিটার্স কি দেশে নেই? সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের একটা সার্টিফিকেট দিলেন না প্রধানমন্ত্রীর শুকরিয়ার পরও? নিউজউইক 'ফিলদিয়েস্ট' দেশের তালিকায় ১ নম্বরে স্থান দিয়েছে বাংলাদেশকে। পিটার্স তারও প্রতিবাদ করলেন না। বাংলাদেশ সরকারও এর বিরুদ্ধে মামলা করলো না। কী যে হচ্ছে কে জানে?

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসীদের অধীনে নিয়ে আসতে চেয়েছে জামায়াত-বিএনপি। এতে তারা সফল হয়েছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখি কমপক্ষে দশটি খুন আর কিছু শিশু-বালিকা ধর্ষণের খবর। খুন করে, শিশু ধর্ষণ করে তারা একেকটি পরিবারকে দমিত করতে চাচ্ছে। তাদের মতে, এভাবে ১৪ কোটি লোক দমিত থাকবে আর তারা রাষ্ট্র দখল করে নেবে। আর এতে বৈধতা দেয়ার জন্য সর্বস্তরে করা হবে সাঈদীয় নির্বাচন। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এ কারণেই লিখেছেন, 'এ সবই প্রমাণ করে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের একটি প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে দেশে। রাষ্ট্র পরিচালকরা প্রমাণ করছেন ক্ষমতা আইনের উর্ধ্বে। যে ক্ষমতা আইনের উর্ধ্বে, সে ক্ষমতার বিরুদ্ধেই গণঅভ্যুত্থান ঘটে।' (*জনকণ্ঠ*, ২৮.৪.২০০২) জনাব মেননও দুঃখের সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের 'আরেকটি গণঅভ্যুত্থানের জন্য' প্রস্তুত থাকার।

জনাব সাঈদ বলেছেন, 'আমার ওপর আস্থার বিষয়টি দেশবাসী বিচার করবে। আমার অতীত ও বর্তমানের কাজকর্ম সবই তারা পর্যবেক্ষণ করছে।' (*ভোরের কাগজ*, ২৮.৪.২০০২) জী, আমরা পর্যবেক্ষণ করছি এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বৈধকরণে যে নির্বাচন দরকার সে নির্বাচন একমাত্র হতে পারে জনাব সাঈদের কল্যাণে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যারা সমর্থক, তারা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন ভবিষ্যতের সব সাঈদীয় নির্বাচনে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯.৪.২০০২

www.pathagar.com

ওই দেখা যায় চমৎকার

আমার বন্ধু জানালো ঘটনাটি। তার ছেলে নান্টুর বন্ধু আসিফের বাবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাংলাদেশে আজকাল প্রায়ই এসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিবৃতি দেন। বিদেশি কোনো পত্রিকায় বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কিত কোনো কিছু থাকলেই বিবৃতি দিতে হয় বা বিবৃতিদাতার আশপাশে থাকতে হয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এরকম একটি ঘটনা সম্পর্কে আসিফের বাবাকে বিবৃতি দিতে হয়েছে বা তিনি আশপাশে ছিলেন। যা ঘটেছে তার সঙ্গে বিবৃতির কোনো সম্পর্ক ছিলো না। টিভিতে এটি দেখে আসিফের বন্ধু নান্টু সবার সামনে আসিফকে বলেছে : কিরে আসিফ, তোর বাবা যে মিথ্যা কথা বলে! আসিফের অবস্থা অনুমেয়।

বাবা-মা বা কোনো নিকটজন যখন সমাজে চোর, জালিয়াত, ঘুষখোর বা মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত হন, তখন তার সন্তানদের অবস্থা কী হয় তা বোধহয় তারা অনুধাবন করেন না। অবশ্য যে মিথ্যা বলছে বা ঘুষ খাচ্ছে, তার কিছু আসে যায় না। তার মনে হয় সে ঠিক কাজটিই করছে। কিন্তু সমাজে তার সন্তানদের পরিচয় হয় ঘুষখোর বা মিথ্যুকের ছেলে। যেমন রাজাকারের ছেলে, সে যতোই ভদ্র ও সৎ হোক, তার কপালে লটকে থাকবে রাজাকারের ছেলে, দেশপ্রেমিকের নয়। যেমন শেখ হাসিনাকে যতোই অপছন্দ করুন, অন্তিমে তার পরিচয় হয়ে ওঠে জাতির জনক বা বঙ্গবন্ধুর কন্যা। বেগম জিয়াকে যতোই সমালোচনা করুন, অন্তিমে তার পরিচয় দাঁড়ায় জেনারেল জিয়ার স্ত্রী।

জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এরকম মিথ্যা হরদম বলছে। লতিফুর-সাঈদ-মুয়ীদ-জেনারেলদের সাহায্যে এ জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করার পর মনে করছে, দেশটা বোধহয় তারা নিলামে কিনে নিয়েছে। নয়তো তারা এমনসব কর্মকাণ্ড করবে কেনো, যার সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ১৮ নভেম্বর প্রেস ব্রিফিঙে পিআইও বললেন, 'যৌথ বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুর খবর সরকার বিশ্বাস করে না।' একবার ভাবুন ব্যাপারটা! সেনা হেফাজতে পেটানোর পর গড়ে প্রতিদিন একজন করে নিহত হয়েছে। কয়েকজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশ্য তারা উল্লেখ করেছে, এসব মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক বা গণপিটুনি। 'হাসিনা কণ্ঠ' বলে যেসব পত্রিকাকে সরকার সমর্থকরা ব্যঙ্গ করেন, সেগুলোর কথা বাদ দিই; 'খালেদা কণ্ঠ' বলে পরিচিত পত্রিকাগুলো তো হরদম এসব খবর ছাপছে, আন্তর্জাতিক মাধ্যম এগুলো প্রচার করছে এবং বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলো এর প্রতিবাদ করছে। পিআইও'র মন্তব্যে ব্যাপারটা দাঁড়ালো- তারা শূন্যে দাঁড়িয়ে বিবৃতিগুলো দিয়েছেন এবং সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছেন।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কড়া ভাষায় গত এক বছরের সরকারি কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছে। এর মধ্যে হিন্দু ও আওয়ামী নিধন, সেনাদের সহিংস কার্যকলাপ, সাংবাদিকদের নাজেহাল করা থেকে আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান লুটের ঘটনাও আছে। তো বলা হলো, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কোনো বস্তুই নয়। তাহলে ইউরোপীয় কমিশনের দূত কেনো নিজ হাতে সেই নিন্দা প্রস্তাব সরকারকে পৌঁছে দেন? এরকম তীব্র নিন্দা গত ত্রিশ বছরে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট করেনি। তার মানে, বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা অতীব মন্দ। সরকার বলছে, যেসব বিষয়ের নিন্দা করা হচ্ছে, এগুলো ঠিক নয়। অর্থাৎ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট মিথ্যাবাদী।

বেগম জিয়া খুলনায় নাম না উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, বিদেশে শেখ হাসিনার বক্তৃতা

www.pathagar.com

দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। ফলে ছেলেমেয়েরা বিদেশ যেতে পারবে না। কিন্তু বেগম জিয়ার সরকার যে বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে মিথ্যুক বলছেন, এতে কি তারা সম্মানিত বোধ করছে? শেখ হাসিনার কথায়ই তারা কনভিন্সড হচ্ছে, এর মানে কি শেখ হাসিনা একাই তাদের চার জোট বা রাষ্ট্র থেকে বেশি শক্তিশালী? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এই একক শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের টিকে থাকা মুশকিল হবে। সরকার ভাবছে, ক্রমাগত মিথ্যা বললে তা সত্যে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, মানবতাবিরোধী নয় দেশ বলে পরিগণিত হবে। যা হয়তো জোট বিশ্বাস করে এবং আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, বাংলাদেশ সরকার সত্যি সত্যিই এমন।

দুই

দেশি-বিদেশি সব আলোচনায় আমাদের সেনাবাহিনীর কথা আজকাল চলেই আসছে। আমাদের সেনাবাহিনী খুব রহস্যময়। তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংসদ সদস্যরা পর্যন্ত জানতে পারেন না, আমরা তো কোন্ ছার। যেমন ধরুন, কোনো চাকরির বিজ্ঞাপনে বেতনের কথা ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ থাকে। সেনাদের কোনো বিজ্ঞাপনে তা উল্লেখ থাকে না। সরকার যে আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ করে, তার দাম সবাই জানে এবং সব নাগরিক তার জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু ডিএইচও'র জমির দাম কেউ জানে না এবং সেনারা ছাড়া কাউকে সেখানে জমি দেয়া হয় না। এই প্রথাটি পাকিস্তানে খুব প্রচলিত। আর একথা কারো অজানা নয় যে, পাকি সামরিক আদর্শে আমরা বেশ প্রভাবান্বিত। খবরের কাগজে, রাজনীতিবিদদের বক্তৃতায় জেনেছি, সেনারা বাংলাদেশে একমাত্র 'দেশপ্রেমিক' ও 'সার্বভৌমত্ব' রক্ষার ঠিকাদার। ১৩ কোটির দেশে ১২ কোটি ৯৮ লাখ অদেশপ্রেমিক লোক নিয়ে যে তাদের হিমশিম খেতে হয়, বলাই বাহুল্য।

সেনাবাহিনী ডেকে আনায় যে ইতিবাচক কিছু হয়নি তা নয়। অবশ্যই হয়েছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা পালিয়েছে, ছিঁচকে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দাপট কমেছে। অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। তারা যতো না তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার করেছে, তার দ্বিগুণ গ্রেপ্তার করেছে তালিকাবহির্ভূত মানুষ। কেনো? এর উত্তর তারা দিতে পারেনি। ইসলামের রক্ষক হিসেবে তারা মেয়েদের ঘোমটা দিতে, ছেলেমেয়ে একত্রে ঘুরলে বিয়ের কাবিন দেখতে চেয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কানে ধরে ওঠবস করাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো দেশে, একমাত্র আফগানিস্তানে তালেবানি যুগ ছাড়া কোনো সেনাবাহিনী এরকম আচরণ করেনি। কেনো তারা এরকম করছে, তার কোনো উত্তর দেয়া তারা প্রয়োজনও মনে করে না। এসব ঘটনা পত্রপত্রিকা ছেপেছে। বাইরের মানুষ এগুলোর সঙ্গে তালেবানি ঘটনাবলীর মিল খুঁজে পেয়েছে।

সেনারা বিনা কারণে আওয়ামী এমপিদের গ্রেপ্তার করেছে, যা আইন অনুমোদিত নয়। আর বিএনপি-জামায়াতের কোনো এমপি গ্রেপ্তার হয়নি। বরং বিএনপির অস্ত্রবাজ কমিশনারদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা বিদেশে চলে যেতে দেয়া হয়েছে। কে না জানে আইএসআই আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না। বিএনপি-আওয়ামী লীগের অনেককে গ্রেপ্তার করলেও জামায়াতের কোনো নেতা, এমনকি যুদ্ধাপরাধী বা তালেবান বলে যারা পরিচিতি দেয়, সেই আমিনীদের গায়েও আঁচরটি লাগেনি। তবে হ্যাঁ, প্রশংসনীয় একটি কাজ তারা করেছেন। সা. কা. চৌ. ও গি. কা. চৌ'র ক্যাডার বাচাইয়াকে সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করেছে। পত্রিকার খবর অনুযায়ী : সা. কা. চৌধুরী বা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী হচ্ছেন একজন শীর্ষ

www.pathagar.com

বিএনপি নেতা ও সংসদ সদস্য এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা। আর গি. কা. চৌধুরী তার সহোদর এবং বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য।

গতকাল বুধবার রাউজান সেনা ক্যাম্পে আটক অবস্থায় বাচাইয়া সাংবাদিকদের কাছে শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে বেড়ে ওঠার কাহিনী বর্ণনা করে। সে জানায়, এই বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার সে গড়ে তুলেছে চেয়ারম্যান হারুনের মাধ্যমে। গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সঙ্গে তার নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ হতো। টাকার প্রয়োজন হলে কিংবা বিভিন্ন কাজের জন্য গি. কা.র কাছে ০১৭১-৮৭৮১২৯ অথবা ০১৭১-৮৭৮১৯৪ নাম্বারে টেলিফোন করতো। মাঝে মাঝে হারুন চেয়ারম্যানের সঙ্গে চট্টগ্রামে গি. কা.র বাসভবন 'গুডস হিলে' দেখা করতো। গি. কা.র সঙ্গে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় তিন মাস আগে গুডস হিলের বাসভবনে। সেই সময় সঙ্গে হারুনও ছিলো। দুমাস আগে আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী চম্পাইয়ার মাধ্যমে গি. কা. চৌধুরী তার জন্য তিন হাজার টাকা পাঠায়। এভাবে নিয়মিতভাবে সে তার গডফাদারদের কাছ থেকে টাকা পেতো। (*ভোরের কাগজ*, ২৯.১১.২০০২)

সা. কা. চৌ. এবং গি. কা. চৌ'র কিছু হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের কাহিনী কে না জানে। তারা যে পাকি-পছন্দ একথাও বলা হয়। অবশ্য এর সত্য-মিথ্যা আমরা জানি না।

অক্টোবরের নির্বাচনের পর সেনারা যে সাঈদীয় নষ্টামির নির্বাচনে আওয়ামীদের পিটিয়েছিলো, সেকথা পত্রপত্রিকায় অনেকে লিখেছেন। সম্প্রতি তারা ক্যান্টনমেন্টের 'বিজয় কেতন' থেকে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল অপসারণ করেছে বা ঢেকে দিয়েছে। সুতরাং তারা কোন্ পক্ষে তা পরিষ্কার করেছে। এটি প্রশংসাযোগ্য। অন্তত সরকারের মন্ত্রীদের মতো ভণ্ডামি করেনি। আর কে না জানে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধান শত্রু, এখনো। যুদ্ধাপরাধী, জামায়াতিদের পাকিদের খুব পছন্দ। জামায়াতিদের আবার পছন্দ তালেবানরা।

নিন্দুকদের অনেকে বলছেন : আচ্ছা, সেনাদের যেমন আইনের বাইরে রেখে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে, পুলিশকে তা দিলে পুলিশরাও এমন 'সাফল্য' অর্জন করতে পারতো কি-না? বা প্রতিদিন গড়ে সেনা হেফাজতে একজনের ইহধাম ত্যাগ মানবাধিকার লঙ্ঘন কি-না? সেনাবন্ধু ও বহু দলবিদ মওদুদ যে মানবাধিকার কমিশন করছেন, তাতে নাকি সেনাদের কিছু বলা যাবে না। এটা কি তাহলে মানবাধিকার, না মানবাধিকার দলন কমিশন? এসব প্রশ্ন বিদেশিরাও তুলছে। তুলুক। দূরে থেকে এসব প্রশ্ন করা যায়। আমরা করবো না। কিন্তু এসব বিষয়কেই, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় বিদেশিরা নিন্দা করছে। এতে তারা মৌলবাদের ছায়া দেখছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে দেখছে, আইএসআই'র প্রতিরূপ হিসেবে দেখছে। আর সরকার বলছে, এসব তো ভাবমূর্তি বিনাশ করছে। এগুলো কে করছে? আওয়ামী লীগ ছাড়া আবার কে? আমাদেরকে এসব বিশ্বাস করার হুকুম দেয়া হচ্ছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটি কথা বলতে চাই, সেনারা যতোদিন থাকুন আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু পত্রপত্রিকায় দেখছি ইতোমধ্যে নানা ঘটনা ঘটছে। কয়েকদিন আগে ঢাকায় সেনা-পুলিশ সংঘাত হয়েছে। 'নড়াইলে সেনা সদস্যকে পুলিশের বেদম মারধর' (*ভোরের কাগজ*, ২৯.১১.২০০২)। আর সাবেক হলে কী হবে, তা এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিনকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। জানি না তার সঙ্গে এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ চৌয়ের কোনো খটাখটি ছিলো কি-না। তাকে ঘড়ি ছিনতাইয়ের জন্য (তাও এক সার্জেন্টের) গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। গত ৩০ বছরে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। এখন যারা আছেন, তারা যখন সাবেক হবেন, তখন যে কী হবে আল্লাহ জানেন। একজন বললেন, হয়তো

www.pathagar.com

এরকম একজন সাবেক মসজিদে গেছেন নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে এক মুসল্লি দেখলেন তার জুতো চুরি গেছে। তখন হয়তো সাবেককে জুতো চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হবে। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে কি-না ঘটতে পারে!

তিন

দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে ভারি ফ্যাসাদ বেধেছে। পুলিশের একজন নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা কোহিনুর মিয়া, আওয়ামী লীগের নেতাদের যিনি দুলাভাই (আওয়ামী নেতা নাসিম, মতিয়া চৌধুরীদের ওপর একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি বলেছিলেন, 'ধর শালাদের'; পত্রিকার খবর), তাকে কয়েকদিন আগে টিভিতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওমা, একেবারে যে আমাদের মতো মানুষ! কিন্তু পত্রিকায় দেখেছিলাম, মানুষের চোখ উৎপাটনের ব্যাপারে তার দুর্বলতা আছে (হয়তো তার মনে হয়েছে, মানুষ অন্ধ থাকলেই প্রলয় বন্ধ হবে)। পত্রিকায় দেখেছিলাম, একবার মিয়া সাহেব চিৎকার করে হুকুম দিয়েছিলেন, শালাদের চোখ তুলে ফেল। কোহিনুর মিয়া বক্তব্য রাখলেন, দুই বিদেশি সাংবাদিকের ওপর যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই একই ব্যাপারে ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। মিয়া সাহেবের হাতে যখন এরা পড়েছেন, তখন কেসের কী হবে বোঝা যাচ্ছে। কেসের যা-ই হোক, এদের যে বেশিদিন আটক রাখা যাবে না, সে ব্যাপারে অনেকেই একমত। এ ঘটনা এবং তারা যখন বাইরে যাবেন এবং সব ঘটনা বিবৃত করবেন, তখন বাংলাদেশের ভাবমূর্তির কী হবে, তা কি কেউ অনুধাবন করছেন? সরকার দেশের ভাবমূর্তি যাদের হাতে রক্ষার ভার দিয়েছেন, তাদের দু-একজনের (বা ঘটনার) উদাহরণ দিচ্ছি। মূর্খতা কোন্ পর্যায়ে গেলে এসব ঘটে, তা এই উদাহরণে স্পষ্ট হবে। প্রথমে উদাহরণ, তারপর ভাবমূর্তি ফ্যাসাদের আলোচনায় ফিরে আসবো। 'পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ. কে. এম. আবদুল হান্নান ভুঁইয়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে নতুন তথ্য হাজির করেছেন। তিনি বলেন, 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এদেশের রাজনীতি ও সমাজের মানুষের কাছে দুটি কারণে সমাদৃত ও জনপ্রিয়। প্রথমত তিনি কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। দ্বিতীয়ত ৭ নভেম্বর তারিখে তার নেতৃত্বে জেড ফোর্স ঢাকা আক্রমণ করলে তৎকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর বাংলাদেশের প্রধান নিয়াজী তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। শহীদ জিয়ার এ অবদানের কারণে এবং তৎকালীন আর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি না থাকার কারণে পরবর্তী সময়ে সিপাহী জনতা তাকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। যার ফলে দেশে আজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত হয়েছে।'

ড. এ. কে. এম. আবদুল হান্নান ভুঁইয়া এখানেই থামেননি। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। শহীদ জিয়া ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' তিনি ১৯৭৫-পূর্ববর্তী সময়ের সমালোচনা করে বলেন, 'ওই সময় দেশে বাকস্বাধীনতা ছিলো না। কারণ তখন বাকের মধ্যে শাল ঢোকানো হয়েছিলো।' তিনি বিভিন্ন পত্রিকার কলামিস্টদের উদ্দেশ করে বলেন, 'আজকাল তথাকথিত কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীরা শহীদ জিয়া সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে কলাম লেখেন, শহীদ জিয়া না হলে আপনারা আজ কলাম লেখার সুযোগ পেতেন না। বিভিন্ন এজেন্টের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা পেতেন না।' (*ভোরের কাগজ*, ২৭.১১.২০০২)

আল্লাহর এসব মাল সরকারের কোন্ ভাবমূর্তি তুলে ধরে? নিউজউইকের ২ ডিসেম্বর সংখ্যায়

www.pathagar.com

সেন্সর দুটি পাতা কেটে দিয়েছে। এ পাতা দুটিতে নাইজেরিয়ার দাঙ্গার খবর প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই দাঙ্গার খবর টিভিতে কয়েকদিন ধরে দোনো হয়েছে, দেশের পত্রপত্রিকাও তা ছেপেছে। এসব লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের 'মরালিটি' রক্ষায়। অবস্থাটা ভাবুন একবার!

দেশের যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার না. হুদা নিত্যনতুন কল্পনা করছেন, স্বপ্ন দেখছেন- যার একটিও কার্যকর করতে পারেননি। অসহ্য যানজটে মানুষ অস্থির। তার মতে, এটার জন্যও দায়ী আওয়ামী লীগ। তিনি আবার নতুন এক জাতির পিতা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশের সবাই পিতৃপরিচয়ের সঙ্কটে ভুগছে- এরকম ভাবার কী কারণ আছে জানি না। কিন্তু এসব মন্তব্য সরকারের একজন মন্ত্রী সম্পর্কে দেশে-বিদেশে কী ধারণার সৃষ্টি করে?

যাক, ভাবমূর্তি ফ্যাসাদে ফিরে আসি। দিল্লি অভিযোগ করেছে, বাংলাদেশ উগ্রবাদীদের আশ্রয় দিচ্ছে। পাকিস্তানের দূতাবাস আইএসআই'র কেন্দ্র। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন : 'প্রমাণ থাকলে পেশ করুন' (জনকণ্ঠ, ২৯.১১.২০০২)। এবং 'শেখ হাসিনা যেখানেই যান সেখানেই দেশের বিরুদ্ধে কালিমা লেপন করেন। তিনি যেভাবে বলেন, তাতে মনে হয় দেশের ১৩ কোটি মানুষের বিরুদ্ধেই বুঝি বা তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। বাংলাদেশ সবসময়ই ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক চায়' (ইত্তেফাক, ২৯.১১.২০০২)। সুসম্পর্ক তো ছিলোই। খান সাহেবদের দুবছর ভারতের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও করতে শুনিনি, এমনকি ভারতে গ্যাস রপ্তানির আয়োজনও সুসম্পূর্ণ করেছিলেন। গায়ের জ্বালাটা অন্যখানে। ভারত শেখ হাসিনাকে প্রায় সরকারপ্রধানের মর্যাদা দিয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব বাঙালি সাংবাদিকদের ইংরেজি ভাষায় ব্রিফিঙে জানিয়েছেন- এসবই মিথ্যা। বিদেশি ভাষায় বললে হয়তো তার মনে হয়েছে, বক্তব্য জোরদার হয়। মোরশেদ খান প্রমাণ চেয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তারা ঢাকায় পেশ করবে। তারা বিশেষভাবে হরকাতুল জেহাদের কথা বলেছে। আমাদের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, কক্সবাজারে সেনাসদস্যরা থেকে হরকাতুল জেহাদের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। কে জানে পত্রিকা হয়তো অসত্য খবর ছেপেছে। হরকাতুল জেহাদ বলে কিছু আছে নাকি বাংলাদেশে? এরা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী আওয়ামী লীগ। কালিমা লেপনের কথা বলেছেন মোরশেদ খান। অথচ সংযমী পত্রিকা স্টেটসম্যান মন্তব্য করেছে : 'Unusually cautions in her replies to questions on the functioning of the Bangladesh government.'

বিদেশিরা যে ভাবমূর্তি বিনষ্ট করছে, তার প্রমাণ হিসেবে দুজন বিদেশি সাংবাদিককে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কেন্দ্র করে রীতিমতো উইচ হান্টিং চলছে। তারা যাদের সঙ্গে কথা বলছে, তাদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। যেমন সেলিম সামাদ বা সুমি খান। মনে হচ্ছে, আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা হবে এই অজুহাতে। কিন্তু যেসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না সেগুলো হলো :

১. তারা সাংবাদিক হিসেবে বাংলাদেশে আসেননি। তাদের পেশা অন্য। তার মানে কি এক পেশার লোক অন্য কিছু করতে পারবেন না? এরকম অদ্ভুত ঘটনা কীভাবে হয়? ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন বা মওদুদ বা না. হুদা রাজনীতি করেন কীভাবে? তাদের পাসপোর্টে কি পরিচয় হিসেবে পলিটিশিয়ান লেখা আছে?
২. পত্রিকার খবর অনুসারে তারা যাদের সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাদের সবাইকে জানিয়েছেন

www.pathagar.com

তারা সাংবাদিক এবং চ্যানেল ফোরের জন্য সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সেলিম সামাদ বা কিছু সাংবাদিক তাদের সহায়তা করেছেন। তারা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন সরকার সমর্থক, বায়তুল মোকাররমের খতিব, সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক যুদ্ধাপরাধী সাঈদী। আল্লাহর দলের সমর্থকরা, যারা প্রকাশ্যে মিছিল করে। খতিব তো নাকি সাক্ষাৎকারেও জানিয়েছেন, থুতুতে বুশকে ভাসিয়ে দেয়া যাবে। একথা আগেও তিনি বলেছেন। সরকার এই উগ্রবাদীকে কিছুই বলেনি। এখন যারা এগুলো বলছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তারা দেশদ্রোহী হলেন না- হলেন যারা সাক্ষাৎকার নিলেন তারা? খান সাহেবদের মুরোদ আছে এদের (খতিব, সাঈদী) গ্রেপ্তার করার? নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার কী উপায়? যেনো হবুচন্দ্র রাজার বিচার। এরা এসব না বললে তো বিদেশিরা বলতে পারতো না বাংলাদেশ উগ্রবাদীদের দেশ।

৩. বাংলাদেশে প্রচুর বিদেশি আসেন। আমাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে শাসন করে প্রকাশ্যে অনেক কিছু বলে। সরকারের মন্ত্রীরা, সরকারি কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাহলে তারাও কি দেশবিরোধী!

৪. যেসব ঘটনা সাংবাদিকরা লিপিবদ্ধ করেছেন বলে বলা হয়েছে, সেগুলো (ঘটনা) তো দেশের পত্রপত্রিকায়ই উঠেছে। তাহলে সম্পাদকরা দোষী হবেন না কেনো?

সরকার বলে, দেশটি গণতান্ত্রিক এবং সব কর্মকাণ্ডই স্বচ্ছ। কিন্তু কাজ করে উল্টো। এ কারণেই কি রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের সেক্রেটারি জেনারেল রবার্ট মেনার্ড আলতাফ চৌ.কে লিখেছেন : 'The Bangladesh authorities say, they have nothing to hide about the country's political and religious situation, but foreign journalists are treated like enemies and those who help them are harassed.'

মূল বিষয় হলো যারা চিহ্নিত মৌলবাদী, যিনি বুশকে থুতুতে ভাসিয়ে দিতে চান, যুদ্ধাপরাধী, সাম্প্রদায়িক- এরাই হচ্ছে দেশপ্রেমিক। শুধু তা-ই নয়, যারা এসবকে সমর্থন করে, তারাও দেশপ্রেমিক। যারা বিরোধিতা করে, তারা দেশবিরোধী। উল্লিখিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারের এসব কাজ সমর্থন করে রক্ষণশীল ও ইসলামি পত্রিকাগুলো। দৈনিক দিনকাল ১৬ নভেম্বর একটি ছবি ছেপেছে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের। তারা মার্কিন-বিরোধী উক্তি করছিলেন। এখন যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তারা দেশপ্রেমিক আর যারা সাক্ষাৎকার নিলেন তারা দেশবিরোধী। তাহলে এ দেশ সম্পর্কে বিদেশিদের কী ধারণা হবে? সরকারের এসব কর্মকাণ্ডে বিব্রত হয়ে সরকারের অ্যাপলজিস্ট হিসেবে পরিচিত অগ্রজ সাংবাদিক আতাউস সামাদ পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়েছেন : 'ওই দুই বিদেশি সাংবাদিক এবং তাদের স্থানীয় সহায়তাকারীদের গ্রেপ্তার করে যেভাবে গোপনে জেরা করা হচ্ছে, তাতে সরকারের বিপজ্জনক রকম, মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ আমরা আশা করি, সরকার সবসময়ই ঠাণ্ডা মাথায় এবং বিজ্ঞজনোচিতভাবে কাজ করবে। বাইরে থেকে আমরা যারা এসব দেখছি, তাদের অনেকের কাছেই এটা সরকারের সুস্থতার লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না। বরং অস্বাভাবিক আচরণ বলেই মনে হচ্ছে।

১৯৯০ সালে জামায়াতে ইসলামী বা অন্য কোনো ধর্মভিত্তিক দল সরকারে ছিলো না, তবু বিএনপি সরকারকে এ সমালোচনা শুনতে হয়েছিলো যে, তারা মৌলবাদীদের মাথায়

www.pathagar.com

তুলছেন। আর এখন সরকারের এক অংশীদার জামায়াতে ইসলামী, যে দলটিকে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কারণে উগ্র মৌলবাদী বলে বিবেচনা করা যায়, তারা রয়েছে সরকারের অংশীদার হিসেবে। তদুপরি বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের রয়েছে আরো একটি ধর্মভিত্তিক দল। কাজেই এখন বাংলাদেশে মৌলবাদ বা ধর্মীয় উগ্রপন্থার প্রভাব বা বিস্তার নিয়ে কোনো সাংবাদিক কাজ করতে গেলে তাকে যদি সরকার থেকে বাধা দেয়া হয়, তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে মৌলবাদ বা ধর্মীয় গোঁড়ামি সংক্রান্ত যে সন্দেহ পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রচারিত হচ্ছে, তা আরো জোরদার হবে এবং বিশ্বাসযোগ্য হবে। সরকারের এটা বোঝা উচিত ছিলো। বিশেষ করে, এ সরকার যখন নিজেকে উদারপন্থী বলে প্রচার করতে চায়, তখন সাংবাদিকদের সম্পর্কে সরকারের নীতি উদার হওয়া প্রয়োজন ছিলো' (*প্রথম আলো*, ২৯.১১.২০০২)।

এখানে উল্লেখ্য, জনাব সামাদ তার সজ্জন আচরণের জন্য সবার প্রিয়। মুক্তিযুদ্ধে তার পরিবারের অবদান স্মরণীয়। অনেকে অবাক হয়ে বলেন, তিনি কীভাবে নমনীয় হন জামায়াত-বিএনপি-আমিনী জোটের? আমি বলবো, এটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার। এবং অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকদের মতো নয়, মৃদুভাবে হলেও তিনি সরকারের কারণেই যে ইমেজ সঙ্কট তা তুলে ধরেছেন। তার এ সাহসের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

চার

বেদনাদায়ক হচ্ছে যে, সরকার সংসদেও অসত্য তথ্য দিচ্ছে এবং এমনসব আইন করছে যা সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ বা বিদ্বেষহীন নয়। সরকার বলছে, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। অথচ মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের নাম মোছা থেকে পাঠ্যবইয়ে অসত্য তথ্য সবই তারা যুক্ত করছে। ১৯৭১ সালে আলবদর-প্রধান নিজামী সম্প্রতি সংসদে বঙ্গবন্ধুর নামাঙ্কিত কৃষিপদক থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেয়ার প্রস্তাব করেছে, যা পাস হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাদের মিত্র হতে পারেন না, যেহেতু তিনি পাকিস্তান ভেঙেছিলেন। যে জন্য তারা পিতা খুঁজছেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু এখন মৃত হলেও পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসেবে পরিচিত। এবং জামায়াত তাদের দিলপছন্দ। সাম্প্রতিক সংসদ অধিবেশনে 'পুলিশ স্টাফ কলেজ স্থাপনে বিল! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি- এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই, অথচ দুবছর ধরেই এ কলেজ চলছে।' (*জনকণ্ঠ*)

সংসদে আওয়ামী লীগ যখন যায়নি, তখন কিছু বুদ্ধিজীবী, মেরি এ্যান পিটার্সের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের অনেক রাষ্ট্রদূত বারবার এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আওয়ামী লীগ এখন সংসদে গিয়ে যেভাবে নাজেহাল ও অপমানিত হচ্ছে, তাতে কেনো তারা এখনো সংসদে যাচ্ছে তা বোধগম্য নয়। তারা সংসদের এসব অযৌক্তিক কার্যকলাপের অংশীদার হচ্ছেন। ওইসব বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রদূতরা অবশ্য এখন নিশ্চুপ। কেননা তারা 'নিরপেক্ষ'। সংসদে গিয়ে আওয়ামী লীগ হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছে। অবশ্য এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, জামায়াত-বিএনপিও সংসদ কার্যকর হতে দিচ্ছে না। জানি না এতে জোটের ভাবমূর্তি কী দাঁড়াচ্ছে?

স্টেটসম্যান পত্রিকা অনুসারে, শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো- সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে তাকে কতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়। সত্য কথাটাই তিনি বলেছেন : 'You live in a democratic system here', she said. But in Bangladesh 'there is no real democracy; we need more time to learn to practice democracy.... The views of the

www.pathagar.com

leader of the opposition are not asked for.' নিশ্চয়ই মোরশেদ খান এখন বলবেন, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা হচ্ছে।

পাঁচ

মূল বিষয় হচ্ছে, সরকার বলতে চাচ্ছে- তারা উগ্রবাদীর সমর্থক নয়, সাম্প্রদায়িক নয়, সংসদের স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড কী চিত্র তুলে ধরে? না, সে বিষয়ে মন্তব্য করে এ বয়সে কোহিনুর মিয়াদের বা সেনাদের হাতে পড়ে ইহলোক ত্যাগ করতে চাই না। আমি বরং অনুরোধ করবো, মৃদুভাষণের ঈদ সংখ্যায় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর চৈনিক গল্পটি পড়তে। এর সঙ্গে হ্যান্স আন্ডেরসেনের একটি গল্পের কথাও বলবো। সেটি হচ্ছে রাজার নতুন পোশাকের গল্প।

দুই ধাপ্পাবাজ তাঁতি রাজাকে জানালো, তারা রাজার জন্য অত্যাশ্চর্য একটি পোশাক তৈরি করে দেবে। রাজা তাদের প্রভূত খাতির-যত্ন করলেন। যেদিন রাজা নতুন পোশাক পরবেন, সেদিন রাস্তা লোকে লোকারণ্য। রাজা নতুন পোশাক পরে শোভাযাত্রা করে যাবেন। তাঁতি দুজন রাজাকে নগ্ন করে নতুন পোশাক পরালো। যদিও কোনো পোশাক তাদের হাতে ছিলো না। তাঁতিরা বললো, কী চমৎকার পোশাক! সভাসদরা বললো, অপূর্ব! বেরুলেন রাজা রাজপথে। সবাই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললো : কী চমৎকার, যদিও তারা কোনো পোশাক দেখছিলো না। কিন্তু আর্মির ভয় তো তখনো ছিলো। এক শিশু শুধু চিৎকার করে বলে উঠলো- এ কী, রাজামশাই যে ন্যাংটো!

সরকারকে একথা বলার জন্য কোনো শিশু নেই। ছোটবেলায় আমরা বাক্স সিনেমা দেখতাম। সিনেমাওয়ালা খণ্ড খণ্ড স্থিরচিত্র দেখিয়ে বলতো, ওই দেখা যায় চমৎকার। সরকারি মুখপাত্রদের কথা শুনে এখন বলতে ইচ্ছে করে- ওই দেখা যায় চমৎকার।

সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ২ ডিসেম্বর, ২০০২

www.pathagar.com

সরকারি ব্যয় বরাদ্দ : মানব উন্নয়ন লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ ছিলো মাত্র

স্বাধীন বাংলাদেশে 'মানব উন্নয়ন দর্শনই' হওয়া উচিত ছিলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় দর্শন, যে দর্শনে মানব উন্নয়ন হলো স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী সুযোগ (economic oppurtunities), সামাজিক সুবিধাদি (social facilities), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (political freedom), স্বচ্ছতার গ্যারান্টি (transparency guarantee) এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা (protective security)। প্রকৃত অর্থে মানব উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতির মাত্রা কতোটুকু, সেটা বিচারের জন্য স্বাধীনতা-উত্তর ত্রিশ বছরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মানব উন্নয়ন নির্দেশক নিয়ামক খাতসমূহের পাশাপাশি অনুৎপাদনশীল প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, নিরাপত্তা খাতসমূহের রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের বিশ্লেষণ জরুরি। এ বিশ্লেষণ উন্নয়নের মূল ধারায় 'inclusion of the excluded'-কে কীভাবে দেখেছে সেটাও ইঙ্গিত দেয়।

প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের প্রকৃত ব্যয় কতো তা যেহেতু সরকার পাকিস্তান আমল থেকেই রাষ্ট্রীয় 'টপ সিক্রেট' আখ্যায়িত করে সযত্নে গোপন করে চলেছে, অতএব এ বিষয়টি নানাবিধ হিসাব-নিকাশের জন্ম দিয়ে চলেছে, যা উপাত্ত-ভিত্তিক নয় এবং যথেষ্ট মাত্রায় আনুমানিক। প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় এই খাতের মোট ব্যয়ের খণ্ডিত অংশ- এটুকু সহজেই বোঝা যায়। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের (স্থল, বিমান, নৌ) ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম কিংবা বাহিনীসমূহের স্থাপনাসমূহের পেছনে সরকারি ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব। এমনকি সরকারি বাজেটের শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাত, গণপূর্ত খাত, খাদ্য বাজেট, ঋণ পরিশোধ খাত, 'অন্যান্য' ইত্যাকার নানা খাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের সরকারি ব্যয়। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বৈদেশিক ঋণ এবং অনুদানের তথ্যও 'টপ সিক্রেট'। তবে সাধারণভাবে বলা চলে, ১৯৭২ সালকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে ২০০১ সালে এসে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের আয়তন ন্যূনপক্ষে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা এবং আয়তন বৃদ্ধি থেকেও তা সহজে বোঝা যায়।

উপযুক্ত তথ্যহীনতার মধ্যেও বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে একথা বলা সম্ভব যে, আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক কল্যাণ খাতের কাঙ্ক্ষিত গতি রুদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে ইউএনডিপিসহ দক্ষিণ এশীয় মানব উন্নয়ন রিপোর্টে প্রদেয় কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫২ শতাংশ (৩৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫১৭ মিলিয়নে), যেখানে একই সময়ে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ২৫ শতাংশ।

১৯৯৫-১৯৯৬ কালপর্বে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিলো ৩.৭ শতাংশ (যে হার পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কার ব্যয়ের চেয়ে বেশি)।

১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৬ সালে স্থাপনার সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ।

প্রতি ১০০০ হাজার ডাক্তারের বিপরীতে ৬০০০ সেনা সদস্য।

প্রতি ১০০০ শিক্ষকের বিপরীতে ৩০০ সেনা সদস্য। এবং

www.pathagar.com

১৯৭২ থেকে অদ্যাবধি রাজস্ব বাজেট থেকে প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় 'দেখানো' হয়েছে, সেটা শিক্ষা ও ক্রীড়া খাতের চেয়ে বেশি এবং স্বাস্থ্য (জনসংখ্যাসহ) খাতের চেয়ে কমপক্ষে তিনগুণ বেশি।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত এমন কোনো সরকার আসেনি যে উচ্চস্বরে দাবি করেনি যে 'এবার আমরা শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি'। অথচ এটা প্রতারণাপূর্ণ ভাষ্য। ১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গত ত্রিশ বছরে মোট রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ১,৫৭,০৯৩ কোটি টাকা, যেখানে শীর্ষ স্থানে আছে সাধারণ প্রশাসন (১৯.৯%), দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে প্রতিরক্ষা (১৭.৬৪%), তৃতীয় স্থানে শিক্ষা ও ক্রীড়া (১৭.৪৮%, শুধু শিক্ষা নয়- ক্রীড়াসহ শিক্ষা যেখানে শিক্ষা বাজেট জনগণের শিক্ষার লক্ষ্যে ছিলো কি-না সেটা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবিদার), চতুর্থ স্থানে ঋণ পরিশোধ (১২.৬৩%, যে ঋণের ৭৫% জনগণের কাছে পৌঁছেনি), পঞ্চম স্থানে পুলিশ ও বিচার (৮.২১%) এবং ষষ্ঠ স্থানে অন্যান্য (৫.৮১%, যার ব্যাপক অংশ কোনো অর্থেই মানব উন্নয়নমুখী নয়)। এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক যে, রাজস্ব বাজেটে আসলে প্রতিরক্ষার অবস্থান দ্বিতীয় শীর্ষ নয়- শীর্ষস্থানেই। শিক্ষা বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার অংশ, ক্রীড়া বাজেটে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ার অংশ, স্বাস্থ্য বাজেটে প্রতিরক্ষায় নিযুক্তদের অংশ, ঋণ পরিশোধের সঙ্গে প্রতিরক্ষা-সংশ্লিষ্টতার অংশ- এসব কোনোভাবে আলাদা করে দৃশ্যমান প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করলে সেটা ১৭.৬৪ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৩০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। আর সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতটিই হবে রাজস্ব বাজেটের প্রকৃত সর্বশীর্ষ খাত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের গত ত্রিশ বছরে মোট রাজস্ব বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের দৃশ্যমান অংশ ছিলো ১৭.৬৪ শতাংশ। দৃশ্যমান এই হারটি প্রত্যেক পরবর্তী আমলে আগের আমলের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে : ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৫-৭৬-এ (বঙ্গবন্ধুর চার বছর) ১৪.০২ শতাংশ, ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৯০-৯১ (জিয়া ও এরশাদের সামরিক শাসনের ১৫ বছর)-এ ১৬.৯৫ শতাংশ, ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ (খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর)-এ ১৭.৮৪ শতাংশ ও ১৯৯৬-৯৭ থেকে ১৯৯০-২০০০ (শেখ হাসিনার পাঁচ বছর)-এ ১৮.১ শতাংশ। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটেও এ ধারা বহাল আছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মানব বঞ্চনার যে চিত্রটি আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি, সেই প্রেক্ষিত যদি সঠিক হয় সেক্ষেত্রে জনগণের অপার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস এবং/অথবা জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক শ্রেণীর ভিত্তি দুর্বল না হলে এবং/অথবা দুর্বৃত্তদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পেলে বাজেটে প্রতিরক্ষার দৃশ্যমান অংশ এভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ ছিলো মোট ব্যয় বরাদ্দের মাত্র ৯.৪৮ শতাংশ। ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পর্যন্ত তা মোট রাজস্ব ব্যয়ের ১১.৩ শতাংশে সীমাবদ্ধ ছিলো। অথচ ওই বছরগুলোতেই পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসমূহে আত্মীকৃত করা হয়েছিলো। ১৯৭৫-৭৬ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় বরাদ্দ এক লাফে ১৯.৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রক্ষীবাহিনীকে স্থলবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করায় প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছিলো নিঃসন্দেহে; কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে সমর-প্রভুদের ক্ষমতা দখল ওই ব্যয় বরাদ্দ উল্লম্ফনের পেছনে প্রধান নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছিলো বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। প্রতিরক্ষা

www.pathagar.com

ব্যয়ের প্রকাশ্য হিস্যা এক বছরে ১১.৩০ শতাংশ থেকে ১৯.০৬ শতাংশে বেড়ে যাওয়া সরকারি বাজেট প্রক্রিয়ায় সত্যিকার অর্থেই একটা নাটকীয় পরিবর্তন, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তনের একটা বিশেষ সাক্ষী হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। পরবর্তী বছরেই ওই ব্যয় বরাদ্দ আরো বেড়ে ২২.২৭ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিলো। কিন্তু আরেকটি উল্লম্ফনও দৃষ্টিকটুভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে বশে রাখার তাগিদে ১৯৮৩ সালে প্রবর্তিত নতুন বেতন-ভাতা কাঠামোতে সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরের ২২.৭ শতাংশ রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দ 'প্রকাশ্যে' প্রতিরক্ষা বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ রয়ে গেছে আজ অব্দি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সিভিলিয়ান সরকারের মেয়াদ পূর্তির ১১ বছর পেরিয়ে এসেও প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের সঙ্কোচন সম্ভব হয়নি। সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানোর ভীতি হয়তো বা নির্বাচিত সরকারগুলোকে আতঙ্কিত করে চলেছে। আমাদের প্রশ্ন হলো, সরকার যদি জনগণ কর্তৃক জনগণের স্বার্থেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে সামরিক অভ্যুত্থান ভীতি কেনো?

প্রতিরক্ষা খাতে 'দৃশ্যমান' রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি যে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যমান উন্নয়ন বাজেট ব্যয় হয়ে থাকে, সেটার প্রকৃত পরিমাণ 'টপ সিক্রেট'। এমনকি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির মাধ্যমেও সে বিষয়ে কোনোকিছুই জনগণকে জানানো হয় না। বিষয়টি যা-ই হোক না কেনো, এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করছি, তার সঙ্গে মানব উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তার সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এসব কেনাকাটার সঙ্গে জাতীয় অগ্রাধিকার কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, সম্ভবত প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো গুটিকয়েক ক্ষমতাধর ব্যক্তির 'ক্রেতা কমিশন'। প্রকৃত অর্থে মানব বঞ্চনার কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের বিষয়টি সাধারণ কোনো ভ্রান্তি নয়- সেটা সম্ভবত গভীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, জনগণের স্বার্থবিরোধী ও সমাজে বিদ্যমান ব্যাপক অসাম্য জিইয়ে রাখা এবং 'দুর্বৃত্তায়নের ফাঁদ' লালনের অন্যতম কৌশলমাত্র।

যৌথভাবে সাধারণ প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে স্বাধীন বাংলাদেশের সব সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের তুলনামূলক বিচারে সর্বনিম্ন হিস্যা ছিলো ২৩.২১ শতাংশ, ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থবছরে ওই ব্যয়ের হিস্যা সর্বোচ্চ ৪১.২০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিলো। পুরো আশির দশকেই প্রশাসন ও নিরাপত্তা খাতে সরকারি রাজস্ব ব্যয় সাধারণভাবে বেশি ছিলো। নব্বইয়ের দশকে এই দুটো খাতে রাজস্ব ব্যয় ধীরগতিতে কমার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা ২৭.৭৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যুগোপযোগী প্রশাসনিক সংস্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তির (বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তির) সহায়তায় এ দুটো খাতে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব।

মানব উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে স্বাধীনতার তিনটি রূপ : রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি ও সুরক্ষার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সাধারণ প্রশাসনসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতসমূহের ভূমিকা থাকার কথা। এখানে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগসহ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তৃতি ও দক্ষতা-নির্দেশক সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে :

গত প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে সাতাশ বছরই সাধারণ প্রশাসন খাতটি ছিলো রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাত।

www.pathagar.com

১৯৭৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের আয়তন দ্বিগুণ হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ২ শতাংশ অথচ সাধারণ প্রশাসনের বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ (বর্তমানে ৩৯টি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভাগসমূহে প্রায় ১২ লাখ চাকুরে)।
সরকারি ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় হয় প্রশাসনের বেতন-ভাতা হিসেবে।

গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে শাসক দলের রাজনীতিকবৃন্দ, সামরিক আমলাতন্ত্র, সিভিল আমলাতন্ত্র এবং বিকাশমান মুৎসুদ্দী পুঁজির যে 'গ্রান্ড অ্যালায়েন্স' কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতির সিস্টেম ও কাঠামো গড়ে উঠেছে, তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে উন্নয়নে সুশাসন বা 'governance' ইস্যুকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজি লুণ্ঠনের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে সফলভাবে অপপ্রয়োগের এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে সর্বগ্রাসী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেছে বলা চলে। অতএব, যত্রতত্র আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তারকে প্রতিরোধ করতে হবে শুধু সরকারি রাজস্ব ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে নয়- দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, অপ্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত জটিলতা এবং তথাকথিত 'সিস্টেম লস' নিরসনের উদ্দেশ্যে। আমলারা প্রকৃত অর্থে public servant নয়, বরং public-ই আমলাদের servant। সরকারি রাজস্ব ব্যয়ের বহুগুণ বেশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বর্তমানে আমলাতন্ত্রের মধ্যস্থতায় দুর্নীতির কালো পথে পাচার করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের এজেন্টরা- বিদেশি দাতা চক্র, এদেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ঋণখেলাপি চক্র এবং এদের সকলের লালিত চাঁদাবাজ মাস্তানরা। এই আত্মঘাতী লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে হলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের ওপর জনগণের মালিকানা কীভাবে কার্যকরভাবে বাড়ানো যাবে, সে সম্পর্কেও জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। উল্লিখিত ত্রি-মাত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার এটাই হলো প্রথম ও প্রধান পূর্বশর্ত।

আবুল বারকাত : 'বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পাটিগণিত' থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

সিটিজেনস ভয়েসের আলোচনা সভায় বক্তারা

একটি চক্র দেশকে ভালো মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক : সাধারণ নাগরিকদের সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন 'সিটিজেনস ভয়েস' আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী চক্র দেশকে ভালো মানুষের শান্তিতে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, সরকারের আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের একাংশ এবং বিভিন্ন পেশার কিছু ব্যক্তির সমন্বয়ে এই চক্রটি গড়ে উঠেছে। এদের রুখতে হলে সর্বস্তরের নাগরিকদের সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল সোমবার বিকেলে নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'আইনশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি : নাগরিকদের আর্তি' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিটিজেনস ভয়েসের সভাপতি কবি আবুল মোমেন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক বলেন, মুনতাসীর মামুন তার প্রবন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় যথেষ্টই বলেছেন। কিন্তু তারপরও মনে হয় যে, আজকের বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। আমরা সবাই সে অবস্থার কথা জানি, বুঝি। কিন্তু তা প্রকাশের যথাযথ ভাষা কারো জানা নেই। এখন নাগরিকদের উচিত এ অবস্থা ঠেকানোর জন্য করণীয় নির্ধারণ করা।

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মজিবুল হক বলেন, সন্ত্রাসী এবং রাজনৈতিক ক্যাডার একাকার হয়ে গেছে। সন্ত্রাস পুরোপুরি রাজনীতি হয়ে না উঠলেও রাজনীতির অবলম্বন হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের এখন আর্তি নয়, প্রয়োজন হুঙ্কর।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনুপম সেন বলেন, রাষ্ট্র দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমনকারী সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ছাত্র-তরুণদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করে ক্যাডারে পরিণত করা হচ্ছে। এ অবস্থায় শুধু আর্তি করলে হবে না, নাগরিকদের সংঘবদ্ধ হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, যে দেশে আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগ একই সঙ্গে ব্যর্থ হয় সে দেশের ভবিষ্যৎ খুব একটা ভালো হতে পারে না।

বখাটেদের উৎপাতে আত্মহত্যায় বাধ্য হওয়া সিমির মা জেরিনা বেগম তার মেয়ের আত্মহত্যার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, সিমির মৃত্যুর জন্য দায়ীদের যথাযথ বিচার আমরা পাইনি। আমি সন্তানের মা ডাক থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তার হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত হলে আমার তো আর কিছুই থাকলো না।

সভায় *সংবাদের* বার্তা সম্পাদক মুনীরুজ্জামান এবং আইনজীবী ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর, ২০০২

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী সম্পর্কে সিটিজেনস ভয়েসের আলোচনা

রাষ্ট্র এখন নাগরিকদের নিপীড়নের দায়িত্ব নিয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : 'আইনশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি : নাগরিকদের আর্তি' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় স্ব স্ব প্রবন্ধে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন, দেশের মানুষ আজ নিরাশ্রয়। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের নিপীড়নের দায়িত্ব নিজের তাতে তুলে নিয়েছে। যাই ঘটেছে তাকেই ক্ষমতাসীনরা অস্বীকার করছে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও। তিনি বলেন, প্রতিহিংসা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা হয়েছে, যা সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। তারা প্রতিটি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, আন্তর্জাতিক সহানুভূতি না পাওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রতিদিন হত্যার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে। তবে জোট সমর্থক পত্রিকাগুলো লিখেছে এসবের জন্য দায়ী বিএনপি-জামায়াত। তিনি বলেন, এসব কারণে দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে দায়হীনতা, নীতিহীনতা, আইনহীনতা, যা সন্ত্রাস ও দুর্নীতিকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের বিপক্ষে যাবে।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সিটিজেনস ভয়েস আয়োজিত এ আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সংগঠনের সভাপতি কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, অ্যাডভোকেট ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী, দৈনিক *সংবাদ*-এর বার্তা সম্পাদক মুনীরুজ্জামান, সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার ও সন্ত্রাসীদের প্ররোচনায় আত্মহননকারী সিমির মা জেরিনা বেগম বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তার প্রবন্ধে বলেন, আইন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগে নিয়োজিত কিছু ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিত্বকারী রাজনীতিবিদরা এদেশকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সবমিলে একটি চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক মামুন এই চক্রকে 'এক্স চক্র' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিলো প্রথম সিভিল সমাজের প্রধান প্রতিনিধিকে হত্যা, যা রাষ্ট্র অনুমোদন করেছিলো। এ অনুমোদন নিয়ে জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন। তিনি তার ক্ষমতা ও প্রভাববলয় বৃদ্ধির জন্য শেখ মুজিবের হত্যায় খুশি এলিট শ্রেণী ও বাংলাদেশ বিরোধীদের একত্রিত করেন। এ যাত্রায় অনুমোদনে সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও বিচারকদের একাংশ জড়িত ছিলো। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বিচারক সায়েম সিএমএল হয়েছিলেন। সাবেক বিচারপতি সাত্তার জিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনসহ আর দুজন বিচারপতি হাইকোর্টের রায়ে সামরিক শাসন অনুমোদন করেছিলেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান যা করেছিলেন এরশাদও তাই করেছিলেন নির্লজ্জভাবে। ফলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি ব্যাপকতর হয়েছে।

অধ্যাপক মামুন বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের শাসনামলে শেষ দু'বছরে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এর সঙ্গে ভিআইপিরা অথবা তাদের পুত্র-পরিজনরা জড়িত ছিলেন। তবে তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে নেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে দেশের সন্ত্রাস সম্পর্কে তিনি বলেন, এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য হলো যে রাষ্ট্র তা অনুমোদন করেছে এবং 'এক্স' চক্রের বিভিন্নজন এ অনুমোদনে যোগ দিয়েছেন। বস্তুত এ সন্ত্রাসের শুরু হয় বিচারক লতিফুরের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই। নির্বাচনের ঠিক আগে ক্যাপ্টেন, মেজর-কর্নেলরা মাঠে নামেন।

www.pathagar.com

তারা গ্রামাঞ্চলে যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে তা ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরের কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। আওয়ামী লীগ প্রার্থী থেকে শুরু করে সমর্থকদের তারা পিটিয়েছে, আটকে রেখেছে। অধ্যাপক মামুন বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে নিম্ন আদালতে তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে না। এটি না থাকলে মানুষ খুশি হবে। উচ্চ আদালতে এখনো কিছু মানবিক বোধসম্পন্ন বিচারক আছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেখানে বিচার পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে ৭ জন বিচারক বিব্রতবোধ করেছেন। এতো লাজুক বিচারক পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তিনি আরো বলেন, ইদানীং বারী সরকার জাতীয় সাবেক বিচারক ও প্রধান নির্বাচকরা যা বলছেন তাতে বিচার বিভাগের মর্যাদা কমছে। তিনি বলেন, আমাদের যদি সব জায়গায় জবাবদিহিতার ব্যাপার থাকে তাহলে আদালতের বিচারকদেরও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। কারণ আদালত জনগণের টাকায় চলে।

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, সন্ত্রাস এমন বিস্তৃত যে, মানুষ এখন ঘর থেকে বের হতে ভয় পায়। বর্তমানে সরকারিদলের সন্ত্রাসীরা পুলিশের সহযোগিতায় সন্ত্রাস করছে। গত সরকারের আমলেও ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের বিচার হয়নি। তাই সন্ত্রাসের তুলনামূলক বিচার করার কারণ নেই। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দূর করতে হলে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে সংস্কৃতি ও রুচির শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, গত ৩১ বছর দেশে গণতন্ত্র আইনের শাসন ও সাংবিধানিক শাসন বিরতিহীনভাবে চলতে পারেনি বলে দেশে সন্ত্রাসের এতো বিস্তৃতি হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া কালোটাকা ও পেশিশক্তি এবং সন্ত্রাস রয়েছে বলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে না। এছাড়া অপরাধীদের বিচার না হওয়ায় তাদের সাহস বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, এসব সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুনীরুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্পে বসে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। তখনকার খুন, ধর্ষণ, গণহত্যা আমাদের সেই স্বপ্নকে নষ্ট করতে পারেনি। বুকে অনেক সাহস নিয়ে অস্ত্র ধরেছিলাম, কিন্তু বর্তমানে প্রতিদিন সীমা, তৃষ্ণা, মহিমাদের মুখ আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ দুঃস্বপ্ন তাড়া করে। সন্ত্রাসীরা এখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। তিনি বলেন, এমন একটা সময় ছিলো যখন দুর্নীতিবাজরা মাথা উঁচু করে হাঁটে। আর যারা দুর্নীতিবাজ নয় তারা এখন মাথা নিচু করে হাঁটে। দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসের কাছে আমরা যেনো আত্মসমর্পণ করেছি। কেউ দুর্নীতি করে টাকা উপার্জন করলে তার পরিবারের সদস্যরা খুশি হয়। সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে এমনটা হচ্ছে। আমাদের এ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, সিমি আত্মহত্যা করে সন্ত্রাস দুর্নীতির প্রতিবাদ করে গেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন একটি অনিরাপদ দেশ হিসেবে বিশ্বে চিহ্নিত। এমনকি পুলিশও এখন এখানে নিরাপদ নয়। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের ওপর এখন আর কারো বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। তার জন্য সমাজ ও পরিবারের ভেতর থেকে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

জেরিনা বেগম বলেন, বিরাট এক স্বপ্ন নিয়ে সিমি পৃথিবীতে এসেছিলো। পৃথিবীর সন্ত্রাস-দুর্নীতি তাকে বাঁচতে দেয়নি। সিমি জীবন দিয়ে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে গেছে। তিনি বলেন, আর কোনো মেয়েকে যেনো সিমির মতো আত্মহত্যা করতে না হয়। তিনি সিমির আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী সন্ত্রাসীদের ফাঁসির দাবি করেন।

সংবাদ, ৮ অক্টোবর, ২০০২

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এদেশের শিক্ষিত, বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত একটি নাম। তার বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই নির্দোষ গবেষণাধর্মী। ঢাকা শহরের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের অনেক অবহেলিত বিষয়ের ভেতর প্রবেশ করে তুলে এনেছেন প্রকৃত সত্য। কলাম লেখক হিসাবে পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি উচ্ছেদ করার ব্রত নিয়েছেন যেমন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অসঙ্গতিগুলোকেও তেমনি আক্রমণ করেছেন তীব্রভাবে। তার এই স্পষ্টবাদিতায় নাখোশ হওয়া যায়, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা যায় না।